অধ্যায় ৮

মানব শারীরতত্ত্ব: সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ
(HUMAN PHYSIOLOGY: COORDINATION AND CONTROL)

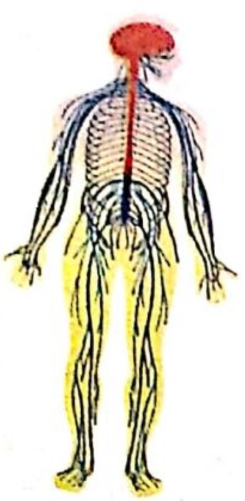

অন্যান্য সকল প্রাণীর মতো মানুষ ও দেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে আচরণগত পরিবর্তন সাধন করে। এটি দেহের সাম্যাবস্থা রক্ষা এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয় ঘটনা। দেহের বিভিন্ন পরিবর্তন দেহস্থ আন্তঃকোষীয় সমন্বয় দ্বারা পরিচালিত হয়। দেহের আন্তঃকোষীয় সমন্বয় প্রধান দুটি উপায়ে সংঘটিত হয়, যথা- স্নায়বিক সমন্বয় (neural coordination) এবং রাসায়নিক সমন্বয় (chemical coordination)। এ অধ্যায়ে মানবদেহের সমন্বয় ব্যবস্থা এবং এদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শব্দাবলি (Keywords)

- নিউরন
- কর্নিয়া
- সিন্যাপস
- কোরয়েড
- করোটিক স্নায়ু
- রেটিনা
- নিউরোট্রান্সমিটার
- হরমোন
- রিফ্রাকটরি পিরিয়ড
- ইউস্টেশিয়ান নালি
- অরগান অব কর্টি
- স্টেরিওস্কোপিক দৃষ্টি

পিরিয়ড সংখ্যা ১২। এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে -

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১। স্নায়বিক সমন্বয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২। মস্তিষ্কের প্রধান অংশের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩। মানুষের বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে করোটিক স্নায়ুর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪। মানব সংবেদী অঙ্গসমূহের গঠনের সাথে কাজের সম্পর্ক তুলনা করতে পারবে। ৫। রাসায়নিক সমন্বয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬। মানবদেহের বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭। দেহের বৃদ্ধি ও আচরণ পরিবর্তনে হরমোনের প্রভাব ও এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● স্নায়বিক সমন্বয় ○ ধারণা ○ মস্তিষ্ক (গঠন, ভাগ, কাজ) ○ করোটিক স্নায়ু (উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কাজ) ● মানব সংবেদী অঙ্গ ○ চোখ (গঠন ও কাজ) ○ কান (গঠন ও কাজ) ● রাসায়নিক সমন্বয় ● অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া ○ পিটুইটারি ○ থাইরয়েড ○ প্যারাথাইরয়েড ○ এড্রেনাল ○ গোনাড ○ অগ্ন্যাশয় (আইলেটস অব ল্যাঙ্গার হ্যান্স) ● হরমোনের প্রভাব ও অনিয়ন্ত্রিত হরমোন ব্যবহারের ফলাফল

৮.১ স্নায়বিক সমন্বয় (Neural coordination)

স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ, অন্ত্র, কলা ও কোষের মধ্যে যে সমন্বয় ঘটে তাকে স্নায়বিক বা নিউরাল সমন্বয় বলে। এক্ষেত্রে স্নায়ু কোষের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা এক কোষ থেকে অন্য কোষে পরিবাহিত হয়। এ বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা পরিশেষে স্নায়ুকোষের প্রান্তে নিউরোট্রান্সমিটার নিঃসরণের মাধ্যমে রাসায়নিক উদ্দীপনায় পরিণত হয়। যেমন, পেশি সঙ্কোচনের জন্য মটর স্নায়ুর মাধ্যমে যে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা প্রেরিত হয় উহা পরিশেষে স্নায়ুপেশির সংযোগস্থলে (neuromuscular junction) অ্যাসিটাইলকোলিন হিসেবে মুক্ত হয়। এ অ্যাসিটাইলকোলিন পেশি মেমব্রেনের উপর ক্রিয়া করে, ফলে পেশি সঙ্কোচিত হয়।

স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system)

ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উদ্ভূত মানবদেহের যে তন্ত্র পরিবর্তনশীল পরিবেশের ও দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে দৈহিক, মানসিক ও শারীরবৃত্তীয় কাজের সমন্বয় ঘটায় তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে। মানবদেহে স্নায়ুতন্ত্র প্রধানত দুভাবে কাজ করে, যেমন-

১। বিভিন্ন সংবেদী উপাত্ত (sensory data) সংগ্রহ ও প্রতিবেদন সৃষ্টি করা স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কাজ। স্নায়ুতন্ত্র যেসব সংবেদী উপাত্তের প্রতি সাড়া দেয় সেগুলো হলো-

- দেহতল দ্বারা-গরম, ঠাণ্ডা, স্পর্শ, চাপ, ব্যথা ইত্যাদি।
- দূরবর্তী ঘটনা- গন্ধ, আলো, শব্দ ইত্যাদি।
- দেহাভ্যন্তরের- উত্তেজনা, মানসিক চাপ, ব্যথা, রক্তচাপ, রক্তে শ্বসন গ্যাস, হরমোন ও গ্লুকোজের মাত্রা।

২। স্নায়ুতন্ত্র দেহের বিভিন্ন চেষ্টীয় (motor) কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন- (i) সকল পেশির সঙ্কোচন-প্রসারণ; (ii) সকল গ্রন্থির ক্ষরণ; (iii) সকল আন্তরযন্ত্রীয় (visceral) অঙ্গের কার্যকলাপ ইত্যাদি।

স্নায়ুতন্ত্রের প্রকারভেদ

১। অঙ্গসংস্থানিক দিক থেকে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র দুইভাগে বিভক্ত, যথা-

(ক) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system-CNS): এটি **মস্তিষ্ক** (brain) এবং **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord) নিয়ে গঠিত।

মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের সবচেয়ে জটিল অংশ। এটি করোটিকার (cranium) মধ্যে সুরক্ষিত থাকে এবং নিউরন (100 বিলিয়ন), নিউরোগ্লিয়া ও এপেনডাইমা সমন্বিত নিউরাল কলা দ্বারা গঠিত। এর অভ্যন্তরে তরলপূর্ণ চারটি গহ্বর বা ভেন্ট্রিকল থাকে।

মস্তিষ্কের পেছন হতে একটি তরলপূর্ণ নালি সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) সৃষ্ট হয়ে সমগ্র মেরুদণ্ড বরাবর প্রসারিত থাকে। এটি মেরুদণ্ডের নিউরাল আর্চ দ্বারা সুরক্ষিত থাকে এবং নিউরন (1 বিলিয়ন), শ্বয়ান কোষ (Schwann cell) ও সেটেলাইট কোষ (settelite cell) সমন্বিত নিউরাল কলা দ্বারা গঠিত।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র মেনিনজেস (meninges) নামক দৃঢ় ও মজবুত পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। মস্তিষ্কের গহ্বর ও সুষুম্নাকাণ্ডের নালিতে (নিউরাল নালি) বিদ্যমান তরলকে **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড** (cerebrospinal fluid) বলে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র হতে সংবেদ গ্রহণ করে এবং উপযুক্ত প্রতিবেদন তৈরি করে।

(খ) প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system-PNS): কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বাইরে অবস্থিত সকল স্নায়ু এবং স্নায়ুকোষ নিয়ে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। এটি মস্তিষ্ক হতে উদ্ভূত 12 জোড়া **করোটিক স্নায়ু** (cranial nerves), সুষুম্নাকাণ্ড হতে উদ্ভূত 31 জোড়া **সুষুম্না স্নায়ু** (spinal nerves), বিভিন্ন সিমপ্যাথেটিক ও অটোনোমিক স্নায়ু এবং এদের গ্যাংলিয়া ও প্লেক্সাস নিয়ে গঠিত। প্রান্তীয় স্নায়ুগুলো মূলত নিউরনের অ্যাক্সন অংশ দিয়ে গঠিত। এসব কোষের মূলদেহের অধিকাংশই কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এবং কিছু কিছু গ্যাংলিয়াতে অবস্থান করে। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র দেহাভ্যন্তর ও পরিবেশ হতে সংবেদ সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে সৃষ্ট প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অঙ্গে প্রেরণ করে।

২। শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে স্নায়ুতন্ত্র দুই ধরনের, যথা-

(ক) সোমাটিক স্নায়ুতন্ত্র (Somatic nervous system): এরা দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন- পেশি, ত্বক, মিউকাস পর্দা, টেনডন, সন্ধি ইত্যাদিতে প্রসারিত থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য এদের **স্বয়ংক্রিয়** বা ভলান্টারি স্নায়ুতন্ত্র বলে। সোমাটিক স্নায়ুতন্ত্র প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশ।

(খ) ভিসেরাল স্নায়ুতন্ত্র (Visceral nervous system): এরা দেহের বিভিন্ন ভিসেরাল অঙ্গ যেমন- গ্রন্থি, পৌষ্টিকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, রক্ত সংবহনতন্ত্র, প্রজননতন্ত্র ইত্যাদিতে প্রসারিত থেকে সংবেদ সংগ্রহ করে এবং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। ভিসেরাল স্নায়ুতন্ত্র কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশ।

CamScanner

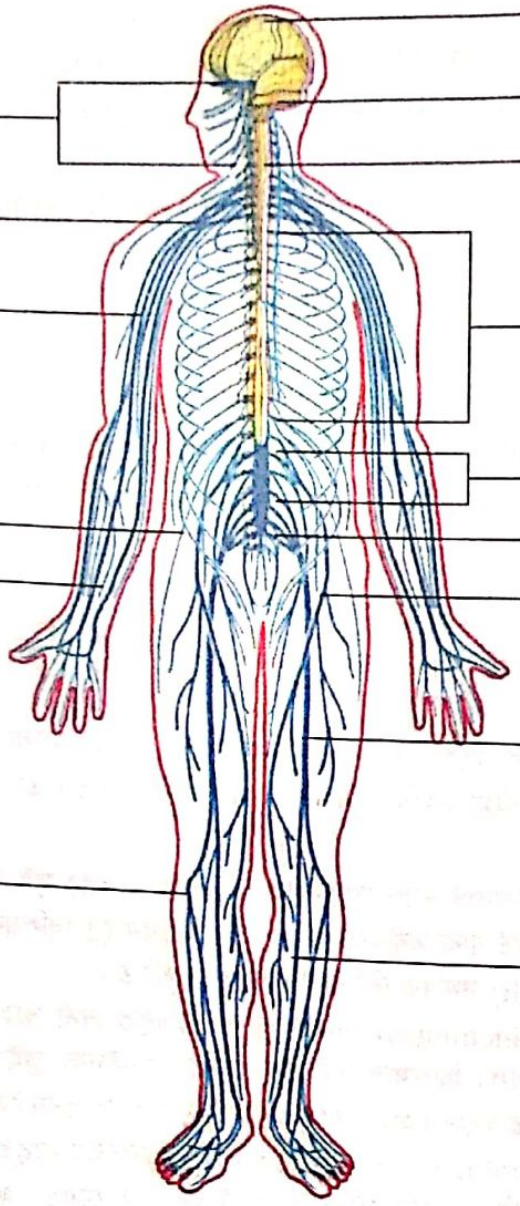

চিত্র ৮.১ মানুষের স্নায়ুতন্ত্র

স্নায়ুকলার গঠন (Structure of nervous tissue)

স্নায়ুকলা দিয়ে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। নিউরন (neurone) নামক একক কোষ দিয়ে স্নায়ুকলা গঠিত। তবে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে নিউরনকে অবলম্বন দেয়ার জন্য নিউরোগ্লিয়া (neuroglia) নামক বিশেষ ধরনের কলা থাকে।

নিউরন (Neuron)

স্নায়ুতন্ত্রের সকল কার্যাবলি উহার গাঠনিক উপাদান নিউরন কোষ দ্বারা সম্পাদিত হয়। প্রতিটি নিউরনই কাজের দিক থেকে একটি ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের সমতুল্য। তাই নিউরনকে স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত একক বলা হয়। সাধারণ কোষের মতো স্বাভাবিক উপাদান দিয়েই নিউরন গঠিত হলেও এরা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একটি জটিল নেটওয়ার্ক গঠন করে এবং স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। মানবদেহের সকল নিউরনকে একত্রে সারিবদ্ধভাবে সংযুক্ত করলে এটি প্রায় 600 মাইল লম্বা হবে। নিউরন মানবদেহের সবচেয়ে দীর্ঘ কোষ হলেও এদের কখনোই মাইটোসিস বিভাজন হয় না।

স্নায়ুকোষ বা কলা ক্ষয়ের কারণে দেহে প্রচণ্ড ব্যাথা, অনুভূতিহীনতা কিংবা পেশির নিয়ন্ত্রণহীনতার সৃষ্টি হয়। একটি নিউরন তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা- (ক) সোমা, (খ) অ্যাক্সন ও (গ) ডেনড্রাইট।

(ক) সোমা (Soma/Cell body): নিউরনের যে অংশে নিউক্লিয়াস থাকে তাকে সোমা বা কোষদেহ বলে। এটি যে কোষঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে তাতে রিসেপ্টর ও আয়ন চ্যানেল থাকে। কোষের কেন্দ্রে অবস্থিত নিউক্লিয়াস বৃহৎ এবং বারবস্তু (Barr bodies) সমৃদ্ধ। নিউরনের সাইটোপ্লাজমকে নিউরোপ্লাজম (neuroplasm) বলে। দেহের অন্য কোষের মতো এটি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, রাইবোসোম, গলগি বস্তু ও অসংখ্য মাইটোকন্ড্রিয়া সমৃদ্ধ থাকে। এছাড়া নিউরোপ্লাজমে অসংখ্য নিউরোফাইব্রিল (neurofibrils) ও নিস্‌ল দানা (nissl granules) থাকে। নিসল দানা প্রকৃতপক্ষে রাইবোসোম গুচ্ছ যেগুলো প্রোটিন সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।

(খ) অ্যাক্সন (Axon): নিউরনের সোমা হতে সৃষ্ট বেশ লম্বা অভিক্ষেপকে অ্যাক্সন বলে। সোমার যে স্থান থেকে অ্যাক্সন সৃষ্টি হয় তাকে অ্যাক্সন হিলোক (axon hillock) বলা হয়। অ্যাক্সনটি নিউরোলেমা (neurolema) নামক একটি আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে।

নিউরোলেমার নিচে প্রোটিন-লিপিড নির্মিত একটি বিচ্ছিন্ন আবরণ থাকে। একে মেডুলারি আবরণ (medulary sheath) বা মায়েলিন আবরণ (myelin sheath) বলে। তবে সব অ্যাক্সনে মেডুলারি আবরণ থাকে না। মেডুলারি আবরণের বিচ্ছিন্ন স্থানে নিউরোলেমা অ্যাক্সনের সংস্পর্শে চলে আসে। এতে অ্যাক্সনের বাইরের দিকে কতগুলো সঙ্কোচনের সৃষ্টি হয়। এসব সঙ্কোচনকে র‍্যানভিয়ারের নোড (node of Ranvier) বলে। অ্যাক্সনের প্রান্তভাগ শাখান্বিত এবং প্রতিটি শাখার শীর্ষভাগ স্ফীত হয়ে টার্মিনাল নব (terminal knobs) বা টার্মিনাল বাটন গঠন করে। অ্যাক্সনের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা সোমা হতে অন্য নিউরনের ডেনড্রাইটের দিকে প্রেরিত হয়।

(গ) ডেনড্রাইট (Dendrites): নিউরনের সোমা হতে সৃষ্ট খাটো ও শাখান্বিত অভিক্ষেপকে ডেনড্রাইট বলে। কোষে সাধারণত এদের সংখ্যা একাধিক থাকে, তবে কোনো কোনো নিউরন ডেনড্রাইট বিহীন। সেনসরি নিউরনে একটি লম্বা ও সরু ডেনড্রাইট থাকে। মটর নিউরনে অনেকগুলো মোটা ডেনড্রাইট থাকে। ডেনড্রাইটে দানাদার ও তন্তুময় নিউরোপ্লাজম প্রসারিত থাকে। সকল ডেনড্রাইটের প্রান্তভাগ শাখান্বিত থাকে যার মাধ্যমে উহা অন্য একটি নিউরনের সাথে যুক্ত থাকে। ডেনড্রাইটের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা সোমার দিকে প্রেরিত হয়।

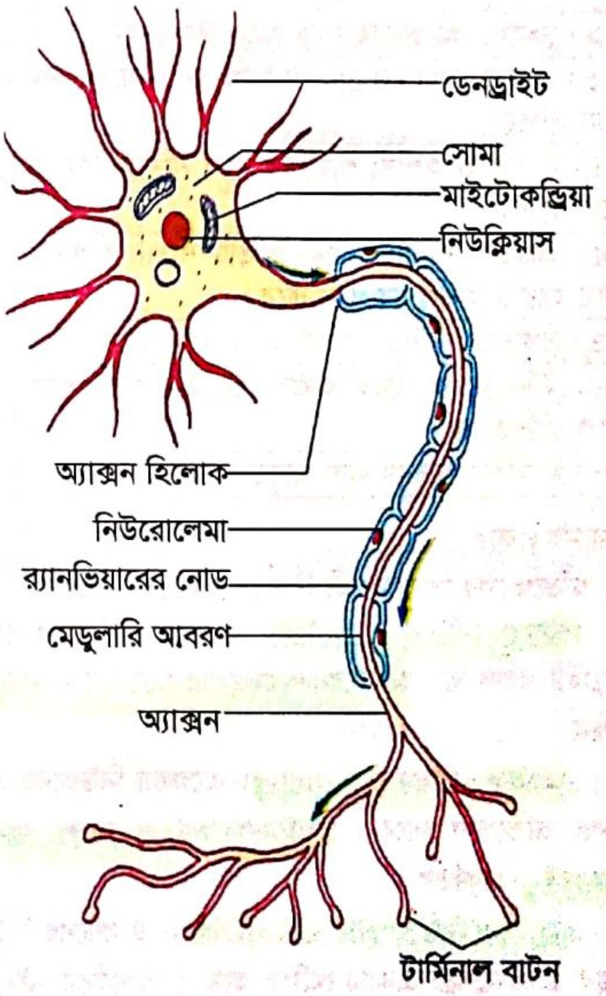

চিত্র ৮.২ একটি নিউরন

. স্নায়ুতন্ত্রে নিউরনের সোমা বা কোষদেহ ঘনিষ্টভাবে একত্রিত হয়ে গ্রে ম্যাটার (grey matter) এবং অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইট একত্রিত হয়ে হোয়াইট ম্যাটার (white matter) সৃষ্টি করে। মানবদেহের সবচেয়ে পুরাতন ও দীর্ঘ কোষ হলো নিউরন। নিউরনের আকার অনেক বড় হতে পারে, যেমন- কর্টিকোস্পাইনাল বা প্রাইমারি অ্যাফারেন্ট নিউরন কয়েক ফুট লম্বা হয়ে থাকে। যদিও দেহের অন্যসব কোষের মৃত্যু ও প্রতিস্থাপন ঘটে কিন্তু নিউরনের মৃত্যু হলে প্রতিস্থাপন ঘটে না।

গ্রে ম্যাটার ও হোয়াইট ম্যাটার কেন?

স্নায়ুতন্ত্রে নিউরনের অসংখ্য কোষদেহ ও অল্প সংখ্যক অ্যাক্সন ঘনিষ্টভাবে একত্রিত হয়ে গ্রে ম্যাটার গঠন করে। জীবন্ত গ্রে ম্যাটার প্রকৃতপক্ষে সামান্য হলুদ বা গোলাপী দাগসহ হালকা ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে রক্তের কৈশিক জালিকা ও নিউরন কোষদেহের সমন্বয়ে এ বর্ণের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে অসংখ্য মায়েলিনযুক্ত অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইট এবং অল্প সংখ্যক কোষদেহ একত্রিত হয়ে হোয়াইট ম্যাটার সৃষ্টি করে। জীবন্ত হোয়াইট ম্যাটার সাদা বর্ণের হয়ে থাকে। অ্যাক্সনের মায়েলিন আবরণের সাদা বর্ণের কারণে হোয়াইট ম্যাটার সাদা দেখায়।

অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইটের মধ্যে পার্থক্য

অ্যাক্সন	ডেনড্রাইট
১। একটি নিউরনে একটি অ্যাক্সন থাকে।	১। একটি নিউরনে এক বা একাধিক ডেনড্রাইট থাকে।
২। কোষের অ্যাক্সন হিলোক থেকে উৎপন্ন হয়।	২। কোষের যে কোনো স্থান থেকে উৎপন্ন হয়।
৩। আকারে লম্বা (0.25-10 মিমি এর উপরে), সম ব্যাস সম্পন্ন।	৩। আকারে খাটো (1.5 মিমি এর নিচে), প্রান্তের দিকে ক্রমশ সরু।
৪। সাধারণত অশাখ: শাখান্বিত হলে সংখ্যায় কম ও দূরে বিস্তৃত।	৪। সাধারণত শাখান্বিত ও নিকট বিস্তৃত।
৫। প্রান্তভাগ শাখান্বিত এবং প্রতিটি শাখার শীর্ষভাগ স্ফীত হয়ে টার্মিনাল নব গঠন করে।	৫। প্রান্তভাগ শাখান্বিত কিন্তু কোন টার্মিনাল নব গঠন কও়ে না।
৬। প্রান্তভাগে নিউরোট্রান্সমিটার ভেসিকল থাকে।	৬। প্রান্তভাগে নিউরোট্রান্সমিটার ভেসিকল থাকে না।
৭। মটর বা আজ্ঞাবহ অর্থাৎ স্নায়ু উদ্দীপনা সোমা থেকে প্রেরিত হয়।	৭। সেনসরি বা সংবেদী অর্থাৎ স্নায়ু উদ্দীপনা সোমার দিকে প্রেরিত হয়।
৮। মায়েলিন আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে।	৮। কোনো মায়েলিন আবরণ থাকে না।

নিউরনের প্রকার

(ক) অভিক্ষেপের সংখ্যানুযায়ী নিউরন 5 ধরনের, যেমন-

১। অমেরু নিউরন (Apolar): এক্ষেত্রে নিউরনের কোনো ডেনড্রাইট থাকে না। অ্যাডরেনাল মেডুলার ক্রোমাফিন নিউরন এ প্রকৃতির।

২। একমেরু নিউরন (Unipolar): এক্ষেত্রে নিউরনের একটি প্রলম্বিত অভিক্ষেপ থাকে। স্পাইনাল কর্ড ও সকল বর্ধনশীল স্নায়ুকোষই এ প্রকৃতির।

৩। ছদ্ম-মেরু নিউরন (Pseudo-polar): এ ধরনের নিউরনে অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইট একত্রে মিলিত হয়ে T আকৃতির গঠন সৃষ্টি করে। স্পাইনাল কর্ডে পাওয়া যায়।

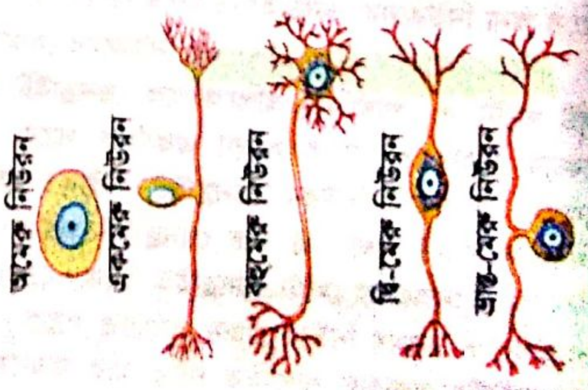

চিত্র ৮.৩ বিভিন্ন ধরনের নিউরন

৪। দ্বিমেরু নিউরন (Bipolar): এক্ষেত্রে নিউরনের একদিকে একটি অ্যাক্সন ও অন্যদিকে একটি ডেনড্রাইট থাকে। চোখের রেটিনার স্নায়ুতে, অন্তঃকর্ণ ও অলফ্যাক্টরি স্নায়ুতে এ ধরনের নিউরন থাকে।

৫। বহুমেরু নিউরন (Multipolar): এ ধরনের নিউরনে একটি প্রলম্বিত অ্যাক্সন ও কয়েকটি খাটো ডেনড্রাইট থাকে। মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডের অধিকাংশ নিউরনই এ প্রকৃতির।

(খ) কাজের উপর ভিত্তি করে নিউরন 3 ধরনের, যথা-

১। **সংজ্ঞাবাহী নিউরন** (Sensory neurons): এরা বিভিন্ন সংবেদ গ্রাহক অঙ্গ (ত্বক, চোখ, নাক, জিহ্বা, কান) থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে।

২। **আজ্ঞাবাহী নিউরন** (Motor neurons): এরা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা ইফেক্টর অঙ্গে (পেশি, গ্রন্থি) প্রেরণ করে।

৩। **আন্তঃসংযোগী নিউরন** (Inter neurons): এরা সংজ্ঞাবাহী ও আজ্ঞাবাহী নিউরনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। অধিকাংশ আন্তঃসংযোগী নিউরন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে অবস্থিত।

নিউরোগ্লিয়া (Neuroglia)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (central nervous system) নিউরনগুলোকে সমর্থন দেয়ার জন্যে বিশেষ ধরনের কিছু স্নায়ুকলা থাকে, এদের নিউরোগ্লিয়া বলে। নিউরোগ্লিয়াতে তিন ধরনের কোষ থাকে, যেমন- অ্যাস্ট্রোসাইট, অলিগোডেনড্রোসাইট ও মাইক্রোগ্লিয়া। এসব কোষ কোনো সিন্যাপস গঠন করে না কিন্তু বিভাজিত হতে পারে, তবে এদের কোনো উদ্দীপনা পরিবহন ক্ষমতা নেই। মানুষের মস্তিষ্কে যে টিউমার হয় উহা মূলত নিউরোগ্লিয়ার অ্যাস্ট্রোসাইট কোষের অস্বাভাবিক বিভাজনের ফল।

১। **অ্যাস্ট্রোসাইট** (Astrocytes): এ কোষগুলো তারকাকৃতির এবং কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত অসংখ্য সাইটোপ্লাজমিক অভিক্ষেপযুক্ত। এগুলোতে অন্যান্য কোষের মতো সকল অঙ্গাণুই বিদ্যমান। এদের অভিক্ষেপ দ্বারা এরা একদিকে রক্তজালিকা এবং অন্যদিকে নিউরনের সাথে সংযুক্ত থাকে। এরা নিউরনে পুষ্টি সরবরাহ করে।

২। **অলিগোডেনড্রোসাইট** (Oligodendrocytes): এ কোষগুলো আকারে তুলনামূলকভাবে ছোট এবং কম অভিক্ষেপযুক্ত। এরা স্নায়ুরজ্জুর মায়েলিন আবরণী গঠন করে।

৩। **মাইক্রোগ্লিয়া** (Microglia): এগুলো ক্ষুদ্র কোষ। এদের দেহে অসংখ্য লম্বা, সরু ও জটিল আঁকাবাঁকা ধরনের অভিক্ষেপ থাকে। রক্ত থেকে এদের উৎপত্তি হয় বলে ধারণা করা হয়। এরা গতিশীল এবং ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে।

চিত্র ৮.৪ বিভিন্ন ধরনের নিউরোগ্লিয়াল কোষ

নেফ্রন ও নিউরনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	নেফ্রন	নিউরন
১। সংজ্ঞা	বৃক্কের গঠনগত ও কার্যগত একককে নেফ্রন বলে।	স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত একককে নিউরন বলে।
২। উৎপত্তি	ভ্রূণীয় মেসোডার্ম থেকে উৎপত্তি হয়।	ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উৎপত্তি হয়।
৩। অবস্থান	কেবল বৃক্কে পাওয়া যায়।	সমগ্র দেহে পাওয়া যায়।
৪। গঠন	রেনাল করপাসল ও রেনাল টিউব্যুল নিয়ে গঠিত।	কোষদেহ, অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইট নিয়ে গঠিত।
৫। প্রকার	তিন প্রকার- সুপারকর্টিকেল, মিডকর্টিকেল ও জাক্সটামেডুলারি ধরনের।	পাঁচ প্রকার- অ্যাপোলার, ইউনিপোলার, সিউডো-ইউনিপোলার, বাইপোলার ও মাল্টিপোলার ধরনের।
৬। কাজ	রক্তশোধন করে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্যসহ মূত্র তৈরি করা এদের প্রধান কাজ।	স্নায়ু উদ্দীপনা গ্রহণ, প্রেরণ ও প্রতিবেদন সৃষ্টি করা এদের প্রধান কাজ।

নিউরোট্রান্সমিটার (Neurotrasmitters)

যে সব রাসায়নিক বস্তু স্নায়ুকোষ থেকে নিঃসৃত হয়ে স্নায়ু উদ্দীপনার তথ্যকে এক নিউরন হতে অন্য নিউরন কিংবা পেশিকোষ কিংবা কোনো গ্রন্থিতে পরিবহনে সহায়তা করে তাদের নিউরোট্রান্সমিটার বলে। নিউরন নিঃসৃত কোনো রাসায়নিক দ্রব্য যখন রক্তে প্রবেশ করে এবং হরমোনের মতো কাজ করে তখন তাকে **নিউরোহরমোন** (neurohormone) বলে। স্নায়ু প্রান্ত থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক বস্তু যখন বহিঃকোষীয় তরল (ECF) বা কোনো সুনির্দিষ্ট অঙ্গে মুক্ত হয় তখন তাকে নিউরোসিক্রেশন (neurosecretion) বলে। দেহে অসংখ্য রাসায়নিক বস্তু আছে যেগুলো স্নায়ুতন্ত্রে ট্রান্সমিটার হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু কেবল নিউরোটান্সমিটার হিসেবে সে সব রাসায়নিক পদার্থই গণ্য হয় যেগুলো-

(i) কেবল সংশ্লিষ্ট নিউরনে সংশ্লেষিত হয়; (ii) প্রিসিন্যাপটিক প্রান্তে সঞ্চিত থাকতে পারে; (iii) কেবল সিন্যাপসে মুক্ত হয়; (iv) পোস্টসিন্যাপটিক মেমব্রেনে সুনির্দিষ্ট রিসেপ্টর দ্বারা গৃহীত হয়; (v) ক্রিয়া শেষে খুব দ্রুত উপযোগী মাধ্যম দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

মানবদেহের কয়েকটি নিউরোট্রান্সমিটার হলোঃ

জৈব অ্যামিন	: ইপিনেফ্রাইন, ডোপামিন, হিস্টামিন, সেরোটোনিন, নরইপিনেফ্রাইন।
পেপটাইড	: এন্ডোরফিন, ডাইনোফিন, সাব্‌সটেন্স-P, নিউরোটেনসিন, সোমাটোস্টেটিন।
অ্যামিনো অ্যাসিড	: GABA, গ্লাইসিন, গ্লুটামিক অ্যাসিড, অ্যাসপারটিক অ্যাসিড।
অন্যান্য-	: অ্যাডিনোসিন, ATP, নাইট্রিক অক্সাইড, CO, অ্যাসেটিলকোলিন, প্রোস্টাগ্লান্ডিন।

সিন্যাপস (Synapse: Greek, *syn*: union, association)

দুটি নিউরনের সংযোগস্থল, যার মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা বা তথ্য এক নিউরন থেকে অন্য নিউরনে প্রেরিত হয় তাকে সিন্যাপস বলে। ব্রিটিশ নিউরোলজিস্ট চার্লস শেরিংটন (Charles Sherrington) 1897 সালে সর্বপ্রথম সিন্যাপস শব্দটি ব্যবহার করেন। এগুলো স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কার্যকরি উপাদান। নিউরনগুলোর তড়িৎরাসায়নিক যোগাযোগ এখানেই ঘটে থাকে। এগুলোর মাধ্যমেই প্রান্তীয় স্নায়ু দ্বারা গৃহীত উদ্দীপনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরিত হয় এবং কেন্দ্রের নির্দেশাবলি প্রান্তের সুনির্দিষ্ট অঙ্গে পৌছায়। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সকল উচ্চতর কার্যাবলি যেমন- সমন্বয়, শিখন, স্মৃতি ইত্যাদি সব কিছুই সম্ভব হয় কেবল সিন্যাপসের কারণে। নতুন সিন্যাপস সৃষ্টি কিংবা সিন্যাপসের পরিবর্তন প্রাণীর জীবনকালব্যাপী অবিরাম চলতে থাকে।

সিন্যাপসের গঠন

দুটি নিউরনের অংশ মিলিত হয়ে সিন্যাপস গঠন করে। যে নিউরনের অ্যাক্সন সিন্যাপস গঠনে অংশ নেয় তাকে **প্রিসিন্যাপটিক নিউরন** বলে। সিন্যাপস গঠনকারী অন্য নিউরনকে **পোস্টসিন্যাপটিক নিউরন** বলে।

প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের **প্রিসিন্যাপটিক মেমব্রেন** এবং পোস্টসিন্যাপটিক নিউরনের **পোস্টসিন্যাপটিক মেমব্রেন** সম্মিলিতভাবে সিন্যাপস গঠন করে। এ দুটি মেমব্রেনের মাঝে প্রায় 20 ন্যানোমিটার ফাঁক থাকে। এ ফাঁককে **সিন্যাপটিক ক্লেফট** (synaptic cleft) বলে। প্রিসিন্যাপটিক মেমব্রেন প্রকৃতপক্ষে প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের অ্যাক্সনের স্ফীত প্রান্তের অংশ। অ্যাক্সনের স্ফীত প্রান্তকে **সিন্যাপটিক নব** (synaptic knob) বলে।

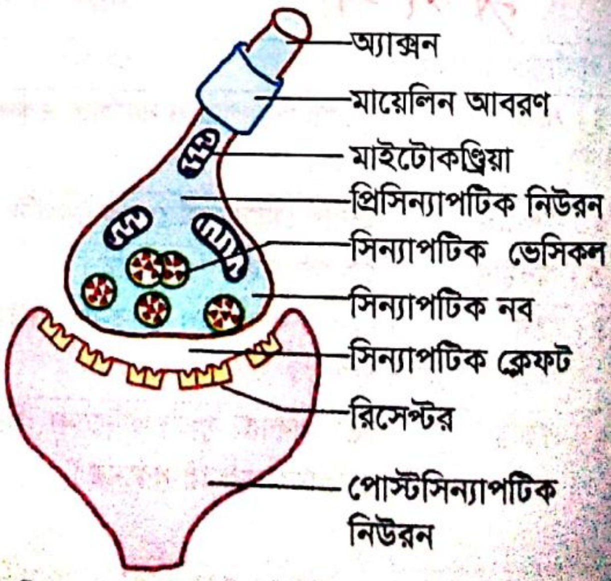

চিত্র ৮.৫ একটি সিন্যাপস

এ নবের ভেতরে অসংখ্য নিউরোট্রান্সমিটারযুক্ত ও মেমব্রেন আবৃত সিনাপটিক ভেসিকল (synaptic vesicles) থাকে। এছাড়া এতে মাইটোকন্ড্রিয়া, মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিক্যুলাম, মাইক্রোফিলামেন্ট ও নিউরোফিলামেন্ট বিদ্যমান থাকে। পোস্টসিন্যাপটিক মেমব্রেন সংশ্লিস্ট নিউরনের সোমা বা ডেনড্রাইট বা অ্যাক্সনের অংশ।

সিন্যাপসের প্রকারভেদ

স্নায়ুতন্ত্রে সিন্যাপস অসংখ্য এবং ধারণা করা হয় এদের সংখ্যা প্রায় 10^{14}। এসব সিন্যাপস বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন নামের হয়ে থাকে। নিউরন অংশের সংযুক্তির ধরন অনুযায়ী সিন্যাপস 4 প্রকার, যথা-

১। অ্যাক্সোডেনড্রাইটিক (Axodendritic): এক্ষেত্রে একটি নিউরনের অ্যাক্সন অংশ অন্য নিউরনের ডেনড্রাইটের সাথে সংযুক্ত থাকে।

২। অ্যাক্সোসোমাটিক (Axosomatic): এক্ষেত্রে একটি নিউরনের অ্যাক্সন অংশ অন্য নিউরনের সোমা বা কোষদেহের সাথে সংযুক্ত থাকে।

৩। অ্যাক্সোঅ্যাক্সোনিক (Axoaxonic): এক্ষেত্রে একটি নিউরনের অ্যাক্সন অংশ অন্য নিউরনের অ্যাক্সনের সাথে সংযুক্ত থাকে।

৪। ডেনড্রোডেনড্রাইটিক (Dendrodendritic): এক্ষেত্রে একটি নিউরনের ডেনড্রাইট অংশ অন্য নিউরনের ডেনড্রাইটের সাথে সংযুক্ত থাকে।

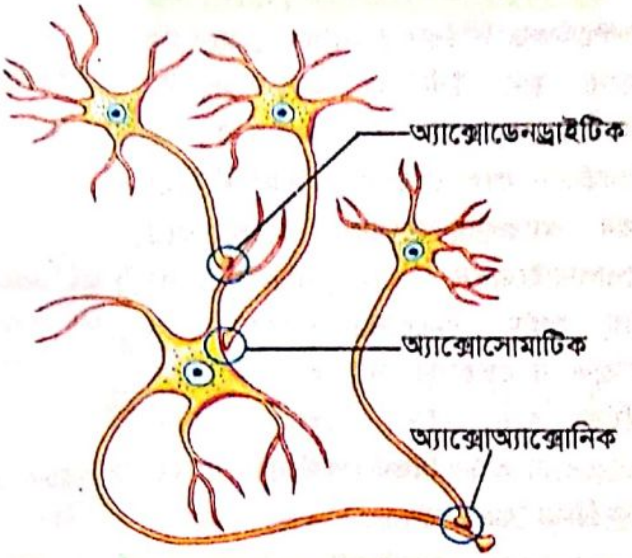

চিত্র : ৮.৬ বিভিন্ন ধরনের সিন্যাপস

সিন্যাপসের কাজ

১। এগুলো এক নিউরন থেকে অন্য নিউরনে স্নায়ু উদ্দীপনা প্রেরণ করে এবং তথ্যের প্রেরণ কেন্দ্র (relay station) হিসেবে কাজ করে।

২। এরা নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থ ক্ষরণ করে এবং প্রচণ্ড উত্তেজনায় এসব ক্ষরণ হ্রাস করে স্নায়ু উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। এরা স্নায়ু উদ্দীপনা বাছাই করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে এবং উদ্দীপনার একমুখী প্রবাহের নিশ্চিত করে।

৪। এরা বিভিন্ন নিউরনের মধ্যে সমন্বয় ঘটায় এবং স্নায়ু উদ্দীপনার গতিপথ নির্ধারণ করে।

স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন (Nerve impulse transmission)

অ্যাক্সনের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন (Axonal transmission)

স্নায়ু উদ্দীপনা কতগুলো ধারাবাহিক রাসায়নিক ক্রিয়ার সমাহার। প্রতিটি নিউরন স্নায়ু উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরবর্তী নিউরনে প্রেরণ করে এবং অবিরাম উদ্দীপনা প্রবাহ নিশ্চিত করে। কতগুলো রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে নিউরনের ডেনডাইট স্নায়ু উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং অ্যাক্সনের মাধ্যমে পরবর্তী নিউরনে প্রেরণ করে। একটি নিউরনের মধ্য দিয়ে স্নায়ু উদ্দীপনা প্রবাহিত হতে 7 মিলিসেকেন্ড সময় লাগে যা আলোর গতির চেয়ে বেশি। স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে প্রতি সেকেন্ড 100 মিটার (328 ফুট) গতিতে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবাহিত হয়। অ্যাক্সনের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন নিম্নে বর্ণনাকৃত 6টি ধাপে সম্পন্ন হয়:

১। পোলারাইজেশন (Polarization): নিউরন যখন উদ্দীপিত থাকে না তখন তাকে পোলারাইজড (polarized) অবস্থা বলে। এ অবস্থায় নিউরন পর্দার বাইরের দিক ধনাত্মক তড়িৎ চার্জযুক্ত (+) এবং ভেতরের দিক ঋণাত্মক তড়িৎ চার্জযুক্ত (-) থাকে। অ্যাক্সনের ভেতরের তরল বা অ্যাক্সোপ্লাজমে K^+ অধিক ঘনত্বে এবং অ্যাক্সনের বহিঃকোষীয় তরলে Na^+ অধিক ঘনত্বে বিরাজ করে। এ অবস্থায় নিউরন পর্দায় একটি Na^+/K^+ চাপ থাকে যা K^+ কে ভেতরে এবং Na^+ কে বাইরে পাঠায়।

২। স্থির বিভব (Resting potential): নিউরন পোলারাইজড থাকা অবস্থায় অ্যাক্সনের বাইরে ও ভেতরে তড়িৎ চার্জের পার্থক্যের কারণে অ্যাক্সন মেমব্রেনে যে তড়িৎ বিভব বজায় থাকে তাকে স্থির বিভব বলে। নিউরন উত্তেজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থা বজায় থাকে।

৩। ক্রিয়া বিভব (Action potential): পোলারাইজড নিউরনের অ্যাক্সন মেমব্রেনের কোনো স্থান উদ্দীপিত হলে সেস্থানের ভেদ্যতার ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের ফলে মেমব্রেনের বাইরের Na^+ আয়ন অ্যাক্সনের ভেতরে প্রবেশ করে ডিপোলারাইজেশন (depolarization) ঘটায় অর্থাৎ মেমব্রেনের বাইরের দিক ঋণাত্মক ও ভেতরের দিক ধনাত্মক তড়িৎ চার্জযুক্ত হয়ে পড়ে। এসময় অ্যাক্সন মেমব্রেনে যে তড়িৎ বিভব (পার্থক্য) সৃষ্টি হয় তাকে ক্রিয়া বিভব বলে।

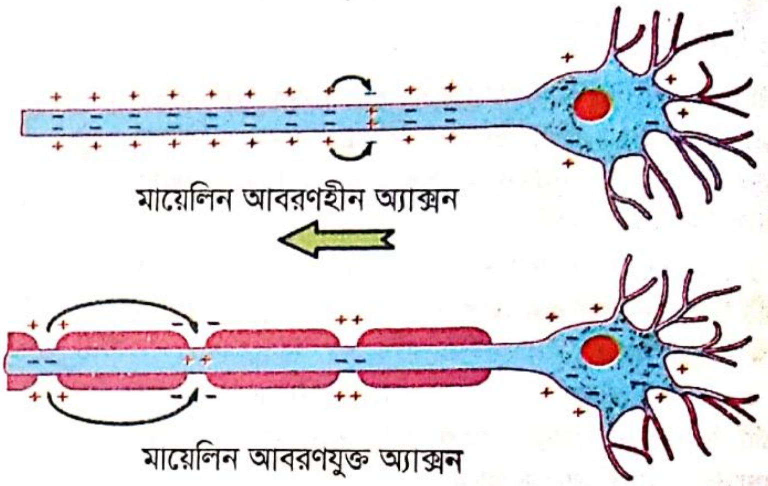

চিত্র ৮.৭ অ্যাক্সনের মধ্যদিয়ে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন

৪। রিপোলারাইজেশন (Repolarization): অ্যাক্সোপ্লাজম Na^+ দ্বারা সম্পৃক্ত হলে নিউরনের অ্যাক্সন মেমব্রেনের একই পথে অ্যাক্সোপ্লাজম থেকে K^+ বের হয়ে যেতে থাকে। এভাবে এক সময় অ্যাক্সন মেমব্রেনের উভয় দিকের তড়িৎ সাম্যাবস্থা পুনঃস্থাপিত হয়। এটি পোলারাইজেশন অবস্থার বিপরীত বলে একে রিপোলারাইজেশন বলে।

৫। হাইপারপোলারাইজেশন (Hyperpolarization): রিপোলারাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে নিউরন পর্দার বাইরে ও ভেতরে যথাক্রমে K^+ ও Na^+ পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকে। একে **হাইপারপোলারাইজেশন** বলে। এ অবস্থা ক্ষণস্থায়ী হয়।

৬। রিফ্রাকটরি পিরিয়ড (Refractory period): স্নায়ু উদ্দীপনা নিউরন অতিক্রম করার সাথে সাথে ক্রিয়া বিভবের সমাপ্তি ঘটে এবং নিউরন পর্দা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে অর্থাৎ পর্দার বাইরের Na^+ ও ভেতরের K^+ পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। একে নিউরনের **রিফ্রাকটরি পিরিয়ড** বলে যা এক মিলিসেকেন্ডের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

মায়েলিন আবরণযুক্ত অ্যাক্সন দ্বারা স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন

অ্যাক্সন মায়েলিন আবরণ দ্বারা আবৃত থাকলে উহা বহিঃকোষীয় তরলের সংস্পর্শে আসতে পারে না। কেবল র‍্যানভিয়ারের নোড বরাবর সংযোগ স্থাপিত হয় এবং স্নায়ু উদ্দীপনা এক নোড হতে অন্য নোডে লাফিয়ে লাফিয়ে পরিবাহিত হয়। এতে স্নায়ু উদ্দীপনার স্বাভাবিক গতি দ্রুত হয়। মায়েলিন আবরণযুক্ত অ্যাক্সন দ্বারা এধরনের দ্রুত গতির স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনকে **লাফিয়ে লাফিয়ে সঞ্চালন বা স্যালটাটরি কনডাকশন** (saltatory conduction; Latin *saltare*, to leap) বলে।

সিন্যাপসের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন (Synaptic transmission)

সিন্যাপসের মাধ্যমে উদ্দীপনা পরিবহন পদ্ধতিকে **সিন্যাপটিক ট্রান্সমিশন** বলে। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। **এটি নিম্নরূপে সংঘটিত হয়-**

১। স্নায়ু উদ্দীপনা প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের অ্যাক্সনের সিন্যাপটিক নবে পৌছালে উহার মেমব্রেন উত্তেজিত হয় এবং এর ভেদ্যতা বেড়ে যায়।

২। এতে বহিঃকোষীয় তরল থেকে প্রচুর পরিমাণ Ca^{++} সিন্যাপটিক নবে প্রবেশ করে। এখানে Ca^{++} মাইটোকন্ড্রিয়ার ATP-age এনজাইমকে সক্রিয় করে।

CamScanner

৩। ATP-age এনজাইম ATP থেকে জৈবশক্তি মুক্ত করে যা সিন্যাপটিক নবে বিদ্যমান ভেসিকলগুলোকে বিদীর্ণ করে নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থসমূহ (অ্যাসিটালকোলিন) বিমুক্ত করে।

৪। নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থসমূহ ব্যাপন পদ্ধতিতে সিন্যাপটিক ক্লেফট অতিক্রম করে পোস্ট সিন্যাপটিক মেমব্রেনে অবস্থিত রিসেপ্টরের সাথে মিশে নিউরোট্রান্সমিটার-রিসেপ্টর যৌগ গঠন করে।

৫। যৌগটি পোস্টসিন্যাপটিক নিউরন পর্দার ভেদ্যতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে বহিঃকোষীয় তরল থেকে Na^+ আয়ন মেমব্রেনের ভেতরে প্রবেশ করে এবং একই সাথে K^+ মেমব্রেনের বাইরে চলে আসে।

৬। Na^+ ও K^+ আদান-প্রদানে পোস্টসিন্যাপটিক মেমব্রেন-এ membrane potential বা action potential সৃষ্টি হয় যা একটি সংকেত সৃষ্টির মাধ্যমে পোস্টসিন্যাপটিক নিউরনের দিকে প্রবাহিত হয়।

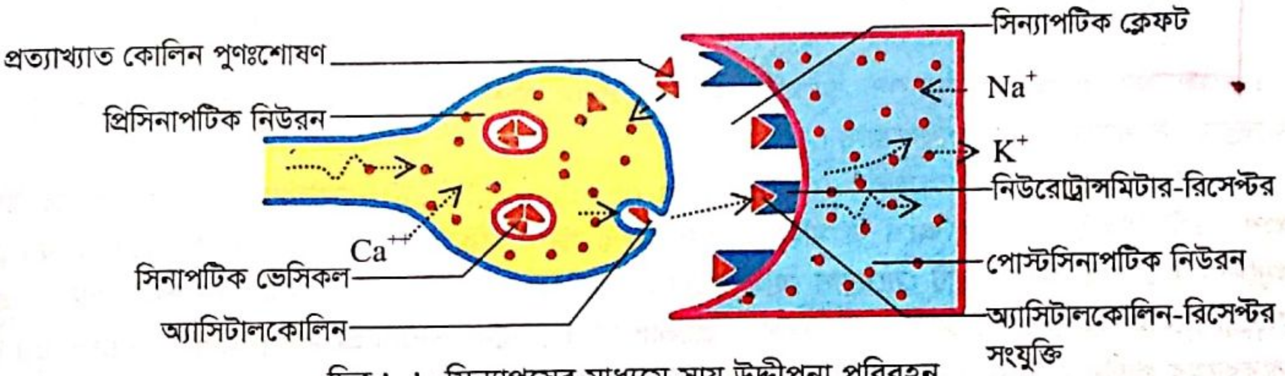

চিত্র ৮.৮ সিন্যাপসের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন

৮.২ মস্তিষ্ক: গঠন ও কাজ (Brain: Structure and Functions)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে স্ফীত, বৃহৎ ও জটিল অংশ মানুষের করোটির (skull) সুরক্ষিত করোটিকার (cranium) মধ্যে অবস্থান করে এবং দেহের সকল কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে, বিশাল তথ্যরাশি প্রক্রিয়া ও সংরক্ষণ করে তাকে **মস্তিষ্ক বা ব্রেইন বা এনসেফালন** (brain or encephalon) বলে। ভ্রূণীয় বিকাশের সময় এক্টোডার্ম থেকে সৃষ্ট নিউরাল টিউবের সামনের অংশ স্ফীত হয়ে মস্তিষ্ক গঠন করে। প্রাণিজগতের মধ্যে মানব মস্তিষ্কই সবচেয়ে জটিল। এর জটিলতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ব্রিটিশ শারীরতত্ত্ববিদ চার্লস শেরিংটন একে **"great ravelled knot" বা 'বৃহৎ জটপাকানো গাঁট'** হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন পুরুষের প্রায় 1500 সিসি ও মহিলাদের প্রায় 1300 সিসি এবং গড় ওজন প্রায় 1.3-1.4 কেজি যা দেহের মোট ওজনের 2% গঠন করে। মানব মস্তিষ্কের পৃষ্ঠতলের মোট আয়তন প্রায় 25000 বর্গ সেন্টিমিটার। মস্তিষ্কে প্রায় 100 বিলিয়ন (এক লক্ষ কোটি) নিউরন এবং 1 বিলিয়ন (100 কোটি) সমর্থনকারী কোষ নিউরোগ্লিয়া থাকে।

যে কোনো সময় মানুষ তার মস্তিষ্কের মাত্র 4% কোষ বা নিউরন ব্যবহার করে। মানবদেহে যত শক্তি উৎপাদিত হয় তার একটি বড় অংশ (20%) ব্যবহার করে মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের মোট ওজনের 75%ই পানি যা এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্কে প্রায় 150,000 মাইল রক্তনালিকা থাকে যাতে উচ্চগতিতে রক্ত প্রবাহিত হয়।

মানব ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায় মস্তিষ্ক প্রধান তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত থাকে। পূর্ণাঙ্গ মানুষে এটি আরো জটিলরূপ ধারণ করে এবং বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়। নবজাতক শিশুর মস্তিষ্কের আয়তন প্রথম বছরেই প্রায় 3 গুণ বৃদ্ধি পায়। মানব ভ্রূণের মস্তিষ্কের গঠনের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ মানুষের মস্তিষ্ককে প্রধান তিনভাগে ভাগ করা হয়, যথা-

১। **অগ্রমস্তিষ্ক বা প্রোসেনসেফালন** (Fore brain or procencephalon),

২। **মধ্যমস্তিষ্ক বা মেসেনসেফালন** (Mid brain or mesencephalon) এবং

৩। **পশ্চাৎমস্তিষ্ক বা রম্বেনসেফালন** (Hind brain or rhombencephalon)।

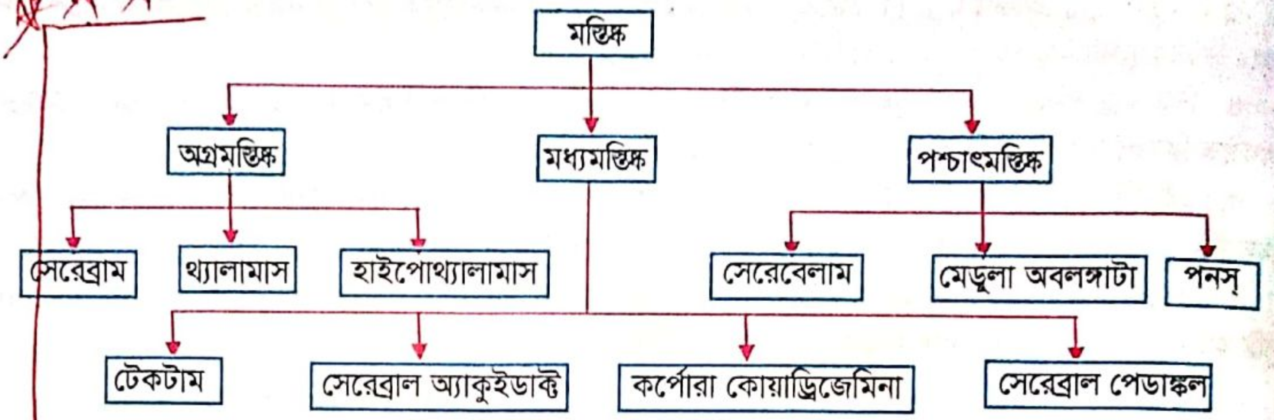

১। **অগ্রমস্তিষ্ক বা প্রোসেনসেফালন:** অগ্রমস্তিষ্ক মস্তিষ্কের প্রধান অংশ গঠন করে। এটি তিন অংশে বিভক্ত, যথা- সেরেব্রাম, থ্যালামাস ও হাইপোথালামাস।

(ক) সেরেব্রাম বা টেলেনসেফালন (Cerebraum or telencephalon)**:** সেরেব্রাম মস্তিষ্কের সবচেয়ে উপরের অংশ। এটি মস্তিষ্কের সর্ববৃহৎ অংশ যা মস্তিষ্কের প্রায় 80% গঠন করে এবং অন্যান্য অংশকে ঢেকে রাখে। একটি অনুদৈর্ঘ্য খাঁজ দ্বারা বিভক্ত দুটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার (cerebral hemisphere) সমন্বয়ে সেবেব্রাম গঠিত। প্রতিটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের অভ্যন্তরে একটি তরলপূর্ণ প্রকোষ্ঠ থাকে। এদের পার্শ্বীয় প্রকোষ্ঠ (lateral ventricle) বলে। সেরেব্রামের প্রাচীর দুটি স্তর নিয়ে গঠিত। বাইরের দিকের প্রায় তিন সেন্টিমিটার পুরু ও স্নায়ুকোষ সমৃদ্ধ গ্রে ম্যাটার (grey matter) নির্মিত স্তরকে সেরেব্রাল কর্টেক্স (cerebral cortex) বলে। এর ভেতরের অপেক্ষাকৃত পাতলা ও স্নায়ুতন্তু সমৃদ্ধ হোয়াইট ম্যাটার (white matter) নির্মিত স্তরকে সেরেব্রাল মেডুলা (cerebral medulla) বলে।

সেরেব্রাল কর্টেক্সের বহির্তল কুণ্ডলিত হয়ে অসংখ্য ভাঁজের সৃষ্টি করে। এসব ভাঁজের উঁচু স্থানসমূহকে জাইরি (বহুবচন-gyri, একবচন-gyrus) এবং নিচু স্থানসমূহকে সালকি (বহুবচন-sulci, একবচন-sulcus) বলে। এতে সেরেব্রামকে 5টি খণ্ডে বা লোবে বিভক্ত দেখা যায়। যেমন- ফ্রন্টাল লোব (frontal lobe), প্যারাইটাল লোব (parietal lobe), টেম্পোরাল লোব (temporal lobe), অক্সিপিটাল লোব (occipital lobe) এবং লিম্বিক লোব (limbic lobe)।

সেরেব্রামের কাজ: মস্তিষ্কের সেরেব্রাম সকল সংবেদী তথ্যকে সমন্বয় ও প্রক্রিয়াজাত করে। বাকশক্তি, স্মৃতিশক্তি, চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, সৃজনশীলতা, ইচ্ছাশক্তি, সহজাত প্রবৃত্তি, কর্মপ্রেরণা ইত্যাদির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এটি দেহের সকল ঐচ্ছিক পেশির সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে। তাই মস্তিষ্কের সেরেব্রাম অঞ্চল আঘাত প্রাপ্ত হলে মানুষ প্যারালাইজড হয়ে যায়।

(খ) থ্যালামাস (Thalamus)**:** সেরেব্রামের নিচের দিকে মেডুলা সংলগ্ন দুটি ক্ষুদ্র ও ডিম্বাকৃতির থ্যালামাস থাকে। এগুলো গ্রে ম্যাটার (grey matter) দিয়ে গঠিত। একটি স্নায়ুরজ্জুর যোজক দ্বারা এরা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। প্রতিটি থ্যালামাসের সাথে গ্রে ম্যাটারে গঠিত একটি পিণ্ডাকার বেসাল গ্যাংলিয়া (basal ganglia) যুক্ত থাকে।

থ্যালামাসের কাজ: এটি গন্ধ ব্যতিত সকল সংবেদী উপাত্তকে সমন্বয় করে সেরেব্রামে প্রেরণ করে। এটি স্পর্শ, ব্যথা, চাপ, ক্রোধ, আবেগ ইত্যাদি অনুভূতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এটি মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় এবং সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়। এটি বিভিন্ন ভিসেরাল ও সোমাটিক কাজের সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। এটি ব্যক্তির সচেতনতার মাত্রা ও সতর্কতার সাথে জড়িত।

(গ) হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus)**:** থ্যালামাসের নিচে গ্রে ম্যাটারের কতগুলো গুচ্ছ নিয়ে হাইপোথ্যালামাস গঠিত। এটি মস্তিষ্কের তৃতীয় প্রকোষ্ঠের মেঝে ও পার্শ্বপ্রাচীর গঠন করে। এর একটি অংশ নিচের দিকে প্রসারিত হয়ে পিটুইটারি গ্রন্থি গঠনে অংশগ্রহণ করে।

CamScanner

হাইপোথ্যালামাসের কাজ: এটি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সকল কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। দেহের হোমিওস্ট্যাটিক রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হাইপোথ্যালামাস তৃষ্ণা, ক্ষুধা, যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে এবং ক্রোধ, ভয় ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি অক্সিটোসিন, অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন (antidiuratic hormone-ADH) ক্ষরণ করে। দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এটি দিবা-রাত্রির ছন্দোময়তার সাথে ঘুম-জাগ্রত চক্র নিয়ন্ত্রণ করে। এ অবস্থাকে **জীবতাত্ত্বিক ঘড়ি** (biological clock) বলে।

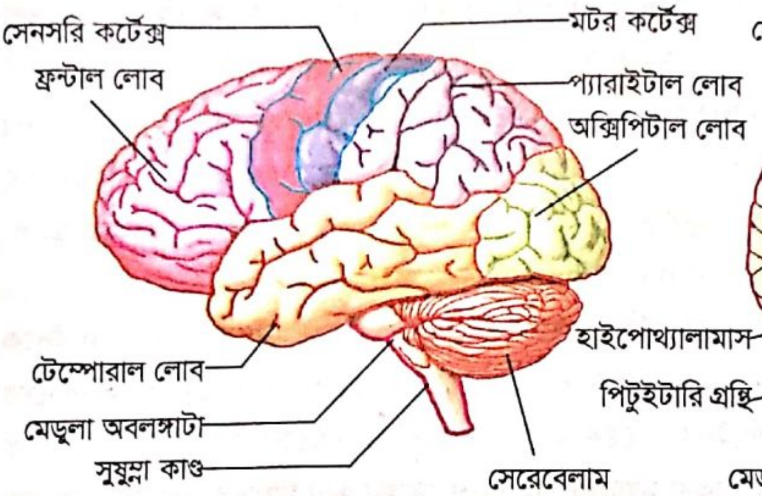

চিত্র ৮.৯ মানব মস্তিষ্কের বাহ্যিক দৃশ্য

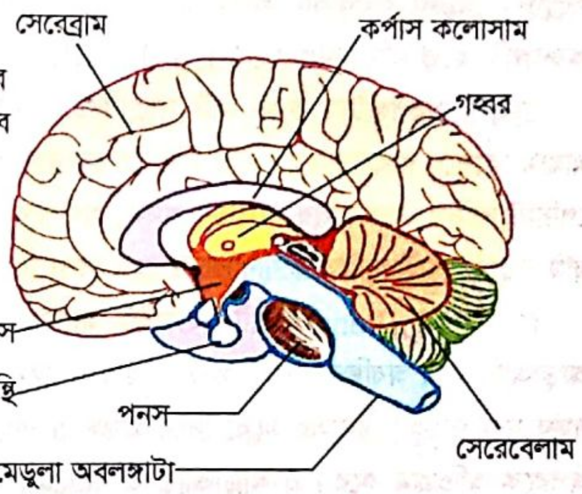

চিত্র ৮.১০ মানব মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীন দৃশ্য

২। **মধ্যমস্তিষ্ক** (Mid brain): হাইপোথ্যালামাসের নিচে এবং সেরেবেলামের সম্মুখে অবস্থিত ছোট ও সঙ্কোচিত অংশকে মধ্যমস্তিষ্ক বা মেসেনসেফালন বলে। এটি হোয়াইট ম্যাটার দিয়ে গঠিত এবং মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় গহবরকে ঘিরে রাখে। অঙ্কীয়দিকে এটি একটি স্নায়ুরজ্জু দ্বারা পনস ও সেরেবেলামকে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের সাথে যুক্ত করে। মধ্যমস্তিষ্ক নিম্নের অংশগুলো নিয়ে গঠিত:

(ক) টেকটাম (Tectum): এটি মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠীয় অংশ।

(খ) সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট (Cerebral aqueduct): এটি মধ্যমস্তিষ্কের ভেতরে অবস্থিত এবং মস্তিষ্কের তৃতীয় ও চতুর্থ গহ্বরকে সংযুক্ত করে।

(গ) কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা (corpora quadregemina): এটি মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠদিকে দুটি গোলাকার খণ্ড নিয়ে গঠিত।

(ঘ) সেরেব্রাল পেডাঙ্কল (cerebral peduncle): এটি মধ্যমস্তিষ্কের অঙ্কদিকে দুটি নলাকার ও পুরু স্নায়ুরজ্জু নিয়ে গঠিত।

মধ্যমস্তিষ্কের কাজ: এটি অগ্র ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। বিভিন্ন ভিজুয়েল (দর্শন) ও অডিটরি (শ্রবণ) তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।

৩। **পশ্চাৎমস্তিষ্ক** (Hind brain): পশ্চাৎমস্তিষ্ক তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা- সেরেবেলাম, পনস ও মেডুলা অবলঙ্গাটা।

(ক) সেরেবেলাম (Cerebelum): করোটিকার নিম্ন-পশ্চাৎ অংশে সেরেবেলাম অবস্থিত। এটি মস্তিষ্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ যা মস্তিষ্কের প্রায় 11% গঠন করে এবং বাইরের গ্রে ম্যাটার নির্মিত কর্টেক্স ও ভেতরের হোয়াইট ম্যাটার নির্মিত মেডুলারি বডি নিয়ে গঠিত। পরিণত মানুষের সেরেবেলামের গড় ওজন 150 গ্রাম। একটি পেডাঙ্কল বা বোঁটার সাহায্যে এটি পনসের সাথে যুক্ত থাকে। দুটি গোলাকৃতির সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার নিয়ে সেরেবেলাম গঠিত যারা একটি সরু ভার্মিস (vermis) নামক স্নায়ুরজ্জু দ্বারা যুক্ত থাকে।

CamScanner

সেরেবেলামের কাজ: এটি দেহের প্রায় সকল ধরনের অনৈচ্ছিক কার্যাবলি যেমন- হাঁচি, কাশি, হেচকি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। এটি পেশির টান, দেহের ভারসাম্য ও ভঙ্গিমা রক্ষা করে। দেহের সকল ধরনের স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। সেরেবেলাম মাথা ও চোখের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে। এটি প্রতিবর্ত মটর ক্রিয়ার স্মৃতি ধারণ করে।

(খ) মেডুলা অবলঙ্গাটা (Medula oblangata): এটি মস্তিষ্কের সবচেয়ে পেছনের অংশ। এটি একটি পিরামিড আকৃতির পুরু গঠন বিশেষ যার প্রশস্ত অংশ উপরের পনসের দিকে ক্রমশ সরু পশ্চাৎ অংশ স্পাইনাল কর্ডের সাথে সংযুক্ত। মেডুলা অবলঙ্গাটা লম্বায় প্রায় 3 সেন্টিমিটার, প্রস্থে 2 সেন্টিমিটার এবং পুরুত্বে 1.2 সেন্টিমিটার। মেডুলা অবলঙ্গাটা হতে ৪টি অর্থাৎ V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ও XII করোটিক স্নায়ুর উৎপত্তি ঘটে।

মেডুলা অবলঙ্গাটার কাজ: এটি সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ রচনা করে বিভিন্ন সংবেদ আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি প্রতিবর্ত কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। এটি খাদ্য গলাধঃকরণ, পৌষ্টিকনালির পেরিস্ট্যালসিস, রক্তনালির সঙ্কোচন-শ্লথন, হৃৎস্পন্দন, ফুসফুসের সঙ্কোচন-প্রসারণ, লালাগ্রন্থির ক্ষরণ, মল-মূত্র ত্যাগ, বমি ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলির নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

(গ) পনস্ (Pons): এটি হোয়াইট ম্যাটার দিয়ে গঠিত সেরেবেলামের অঙ্কভাগে মেডুলার সামনের দিকে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত একটি স্ফীত পিণ্ডাকার গঠন। এতে বিদ্যমান পুরু স্নায়ুতন্তু সেরেবেলাম, মেডুলা ও সেরেব্রামের সাথে যুক্ত থাকে। পনসের মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে বিদ্যমান স্নায়ুতন্তুগুলো আড়াআড়িভাবে একে অপরকে অতিক্রম করে। এ আড়াআড়ি অতিক্রমের কারণে মস্তিষ্কের বাম অংশ দেহের ডান অংশের এবং মস্তিষ্কের ডান অংশ দেহের বাম অংশের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।

পনসের কাজ : এটি প্রতিবর্ত কেন্দ্র (reflex center) হিসেবে কাজ করে, শ্বসন কার্য নিয়ন্ত্রণ করে, স্পাইনাল কর্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে সঞ্চালন পথ হিসেবে কাজ করে। এছাড়া এটি মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সংবেদ প্রবাহের প্রেরণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

সেরেব্রাম ও সেরেবেলামের মধ্যে পার্থক্য

সেরেব্রাম	সেরেবেলাম
১। এটি অগ্রমস্তিষ্কের অংশ এবং পৃষ্ঠদিকে অবস্থিত।	১। এটি পশ্চাৎমস্তিষ্কের অংশ এবং অঙ্কদিকে অবস্থিত।
২। এটি মস্তিষ্কের সর্ববৃহৎ অংশ যা মস্তিষ্কের প্রায় 80% গঠন করে।	২। এটি মস্তিষ্কের দ্বিতীয় বৃহৎ অংশ যা মস্তিষ্কের প্রায় 11% গঠন করে।
৩। দুটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার নিয়ে গঠিত। এরা কর্পাস ক্যালোসাম নামক পুরু স্নায়ুতন্তু দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে।	৩। দুটি সেরেবেলার হেমিস্ফিয়ার নিয়ে গঠিত। এরা ভার্মিস নামক সরু স্নায়ুরজ্জু দ্বারা যুক্ত থাকে।
৪। গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটারের ভেতরে প্রবেশ করে বেসাল নিউক্লিই (basal nuclei) গঠন করে।	৪। হোয়াইট ম্যাটার গ্রে ম্যাটারের ভেতরে প্রবেশ করে বৃক্ষ সদৃশ্য অ্যারবোর ভাইটি (arbor vitae) গঠন করে।
৫। সকল সংবেদী তথ্যকে সমন্বয় ও প্রক্রিয়াজাত করে। এটি ঐচ্ছিক পেশির সঞ্চালন, চলন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।	৫। দেহের প্রায় সকল ধরনের অনৈচ্ছিক কার্যাবলি যেমন- হাঁচি, কাশি, হেচকি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

মস্তিষ্কের গহ্বর বা ভেন্ট্রিকল (Cerebral ventricles)

মস্তিষ্কের অভ্যন্তরভাগ তরলপূর্ণ গহ্বর সমৃদ্ধ। এ গহ্বর কয়েকটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের এসব প্রকোষ্ঠকে ভেন্ট্রিকল (ventricles) বা সেরেব্রাল ভেন্ট্রিকল (Cerebral ventricles) বলে। মস্তিষ্কে মোট চারটি ভেন্ট্রিকল আছে। এদের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভেন্ট্রিকল বলে। ১ম ও ২য় ভেন্ট্রিকলকে পার্শ্বীয় বা ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল বলে। মস্তিষ্কের গহ্বরের তরলকে সেরিব্রোস্পাইনাল তরল (cerebrospinal fluid- CSF) বলা হয়।

১। পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল (Lateral ventricle): অগ্রমস্তিষ্কের দুটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের অভ্যন্তরের প্রকোষ্ঠদ্বয়কে (১ম ও ২য় ভেন্ট্রিকল) ল্যাটারাল বা পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল বলে। দুটি ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ছিদ্র বা ফোরামেন অব মনরো (foramen of Monro) দ্বারা এরা পৃথকভাবে মধ্যমস্তিষ্কের ৩য় ভেন্ট্রিকলের সাথে যুক্ত থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকলের আয়তন বৃদ্ধি পায়।

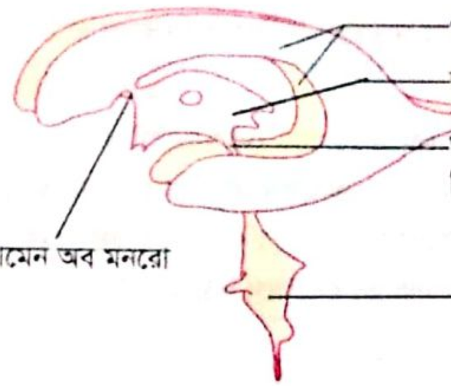

চিত্র ৮.১১ মস্তিষ্কের গহ্বরসমূহ

২। তৃতীয় ভেন্ট্রিকল (Third ventricle): অগ্রমস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের গহ্বরকে ৩য় ভেন্ট্রিকল বলে। এটি একটি অ্যাকুইডাক্ট অব সিলভিয়াস (aqueduct of Silvius) দ্বারা চতুর্থ ভেন্ট্রিকলের সাথে যুক্ত থাকে।

৩। চতুর্থ ভেন্ট্রিকল (Fourth ventricle): এটি পশ্চাৎমস্তিষ্কের মেডুলা অবলঙ্গাটার গহ্বর। এটি পশ্চাৎ দিকে সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালির সাথে যুক্ত থাকে।

মেনিনজেস (Meninges)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ড করোটিকা ও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে একটি দৃঢ় ও মজবুত আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। একে মেনিনজেস বলে। মেনিনজেস তিনটি ঝিল্লি বা পর্দা দ্বারা গঠিত। এছাড়া এতে রক্তনালিকা ও সেরিব্রোস্পাইনাল তরল বিদ্যমান থাকে। মেনিনজেসের ঝিল্লিগুলো হলো-

১। ড্যুরা ম্যাটার (Dura mater): মেনিনজেসের সর্ববহিঃস্থ ঝিল্লিকে ড্যুরা মেটার বা প্যাকাইমেনিক্স (pachymeninx) বা ড্যুরা (dura) বলে। এটি মজবুত ও পুরু এবং এতে শিরা ও সাইনাস প্রসারিত থাকে। মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে ড্যুরা ম্যাটার দ্বিস্তরী এবং করোটিকার সাথে ঘনিষ্টভাবে লেগে থাকে। কিন্তু সুষুম্নাকাণ্ডের ক্ষেত্রে এটি একস্তরী এবং এর বাইরের ও ভেতরের দিকে ফাঁকা স্থান থাকে যাদেরকে যথাক্রমে এপি-ড্যুরাল (epi-dural) ও সাব-ড্যুরাল (sub-dural) স্পেস বলে।

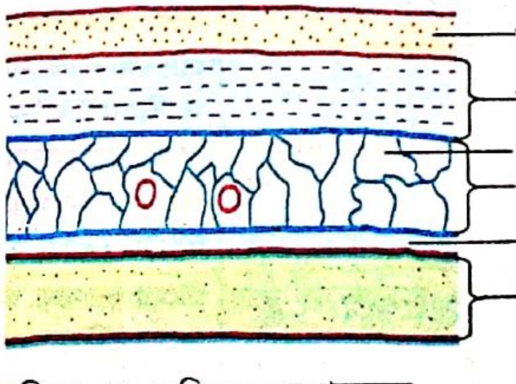

চিত্র ৮.১২ মেনিনজেসের প্রস্থচ্ছেদ

[অস্ত্রোপচারের সময় মানুষকে অজ্ঞান করার জন্য (অ্যানেসথেসিয়া) এপি-ড্যুরাল স্পেসে ইনজেকশনের মাধ্যমে চেতনানাশক প্রদান করা হয়।]

২। অ্যারাকনয়েড (Arachnoid): মেনিনজেসের মধ্যবর্তী ঝিল্লিকে অ্যারাকনয়েড বলে। এটি তন্তুময় কলা দ্বারা গঠিত একটি অভেদ্য, পাতলা ও স্বচ্ছ ঝিল্লি যা কতগুলো চ্যাপ্টা কোষ দ্বারা আবৃত থাকে। কতগুলো তরলপূর্ণ স্থান এ ঝিল্লি দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এসব তরলপূর্ণ স্থানকে সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস (subarachnoid space) বলে। কোনো কোনো স্থানে সাব-অ্যারকনয়েড স্পেস অধিক প্রসারিত থাকে। এদের সিস্টারনি (cisternae) বলে। কেন্দ্রীয়

CamScanner

স্নায়ুতন্ত্রের রক্তনালিকাগুলো এসব স্পেসের মধ্য দিয়ে প্রসারিত থাকে। ২। পায়া ম্যাটার (Pia mater): মেনিনজেসের সর্ব অন্তঃস্থ ঝিল্লিকে পায়া ম্যাটার বা পায়া বলে। এটি মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের পৃষ্ঠতলের সাথে ঘনিষ্টভাবে লেগে থাকে। এটি তন্তুময় কলা দ্বারা গঠিত একটি অভেদ্য ও অত্যন্ত পাতলা ঝিল্লি যার মধ্য দিয়ে রক্তনালি মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডে নীত হয়।

মেনিনজেসের কাজ: এটি মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডকে যান্ত্রিক আঘাত হতে রক্ষা করে। এটি মস্তিষ্কের সঞ্চালনকে করোটিকার অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ রাকে। এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পুষ্টি পদার্থ সরবরাহ করে। এটি সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড ক্ষরণ করে। এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে জীবাণুর সংক্রমণ হতে রক্ষা করে।

মেনিনজাইটিস কি?

মেনিনজেসের প্রদাহজনিত রোগকে মেনিনজাইটিস (meningitis) বলে। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা অন্যকোন জীবাণু দ্বারা মেনিনজেস সংক্রমিত হলে প্রদাহের সৃষ্টি হয়। *Neisseria meningitidis* নামক ব্যাকটেরিয়া জীবাণু দ্বারা মেনিনজেস সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। মেনিনজাইটিসের প্রধান লক্ষণ হলো মাথা ব্যথা ও গ্রীবা শিথিল হয়ে যাওয়া। এছাড়া মনযোগে বিঘ্নতা, বমি, আলোক ও শব্দ সহনহীনতা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়।

মানব মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ভ্রূণীয় মস্তিষ্ক	পূর্ণবয়স্কের মস্তিষ্ক	কাজ
অগ্রমস্তিষ্ক	সেরেব্রাম	সকল সংবেদী তথ্যকে সমন্বয় ও প্রক্রিয়াজাত করে; স্পর্শ, চাপ, কম্পন, ব্যথা, তাপ, ঘ্রাণ ও স্বাদ অনুভূতি গ্রহণ করে; বাকশক্তি, স্মৃতিশক্তি, চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, সৃজনশীলতা, ইচ্ছাশক্তি, সহজাত প্রবৃত্তি, কর্মপ্রেরণা ইত্যাদির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; ঐচ্ছিক পেশীর সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।
	থ্যালামাস	গন্ধ ব্যতীত সকল সংবেদী উপাত্তকে সমন্বিত করে সেরেব্রামে প্রেরণ করে; স্পর্শ, ব্যথা, চাপ, ক্রোধ, আবেগ ইত্যাদি অনুভূতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় এবং সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়; বিভিন্ন ভিসেরাল ও সোমাটিক কাজের সমন্বয় করে; ব্যক্তির সচেতনতার মাত্রা ও সতর্কতার সাথে জড়িত।
	হাইপোথ্যালামাস	স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সকল কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে; অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে; দেহের হোমিওস্ট্যাটিক রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; তৃষ্ণা, ক্ষুধা, যৌন আকাঙ্খা জাগ্রত করে; ক্রোধ, ভয় ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে; অক্সিটোসিন, অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন (ADH) ক্ষরণ করে; দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে; দিবা-রাত্রির ছন্দোময়তার সাথে ঘুম-জাগ্রত চক্র নিয়ন্ত্রণ করে।
মধ্যমস্তিষ্ক	মেসেনসেফালন	অগ্র ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে; বিভিন্ন ভিজুয়েল (দর্শন) ও অডিটরি (শ্রবণ) তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।
পশ্চাৎ মস্তিষ্ক	সেরেবেলাম	দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে; মাথা ও চোখের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে; পেশীর টান ও দেহের ভঙ্গিমা রক্ষা করে; দেহের সকল ধরনের স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
	মেডুলা অবলঙ্গাটা	সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ রচনা করে; প্রতিবর্ত কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে; পৌষ্টিকনালীর পেরিস্ট্যালসিস, রক্তনালীর সঙ্কোচন-শ্লথন, হৃৎস্পন্দন, ফুসফুসের সঙ্কোচন-প্রসারণ, লালাগ্রন্থির ক্ষরণ, মল-মূত্র ত্যাগ, বমি ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলির নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে;
	পনস	সেরেবেলাম ও মেডুলাকে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সাথে সংযুক্ত করে; মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সংবেদ প্রবাহের প্রেরণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; মেডুলার শ্বসন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ফলাফলকে প্রয়োজনে পরিবর্তন করে।

CamScanner

সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (Cerebrospinal fluid-CSF)

মস্তিষ্কের গহ্বর, সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালি, সাব-অ্যারাকনয়েড স্পেস ও সাব-অ্যারাকনয়েড সিস্টারনি যে তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে তাকে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড বলে। সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের প্রাচীর থেকে প্রতিদিন প্রায় 500 মিলিলিটার CSF ক্ষরিত হয়। মেনিনজেস CSF ক্ষরণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এর পরিমাণ সর্বদা পরিবর্তনশীল অর্থাৎ এটি সর্বদা ক্ষরিত ও শোষিত হয়। একজন পরিণত মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে সর্বদা প্রায় 120-150 মিলিলিটার CSF থাকে। এটি পানির মতো স্বচ্ছ তবে এতে কিছু লিম্ফোসাইট কোষ থাকে। এর pH মাত্রা প্লাজমা থেকে সামান্য কম থাকে। রাসায়নিকভাবে CSF-তে প্রোটিন 20-40mg/dL, গ্লুকোজ 45-80mg/dL এবং ক্লোরাইড 720-750mg/dL থাকে। এছাড়া প্লাজমাতে বিদ্যমান সকল উপাদানই এতে বিদ্যমান থাকে। (dL=deciliter)

সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড এর কাজ

১। সুরক্ষা (Protection): এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ভেতরে ও বাইরে থেকে উহাকে বিভিন্ন যান্ত্রিক আঘাত হতে রক্ষা করে। এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে জীবাণুর সংক্রমণ হতে রক্ষা করে।

২। ভাসা (Buoyancy): এটি মস্তিষ্ককে ভাসিয়ে রেখে এর প্রকৃত ওজন 1500 gm থেকে 50 gm-এ হ্রাস করে।

৩। অপসারণ (Elimination): এটি মস্তিষ্ক থেকে বর্জ্য পদার্থ, ইপিনেফ্রাইন ও কিছু ওষুধ অপসারণ করে।

৪। পরিবহন মাধ্যম (Transport medium): মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে হরমোন ও পুষ্টি পরিবহনে CSF মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

৮.৩ করোটিক স্নায়ু (Cranial nerves)

যেসব স্নায়ু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হতে উৎপত্তি লাভ করে করোটিকার ছিদ্রপথে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে গমন করে তাদের করোটিক স্নায়ু বলে। করোটিকার বিভিন্ন ছিদ্র পথে বিস্তৃত হয় বলে এদের নাম করোটিক স্নায়ু। মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর করোটিক স্নায়ু 12 জোড়া। রোমান ক্যাপিটাল সংখ্যা I হতে XII দ্বারা মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহকে সাংকেতিকভাবে চিহ্নিত করা হয়। এদের কিছু সংখ্যক সেনসরি বা সংবেদী, কিছু সংখ্যক মটর বা আজ্ঞাবাহী/চেষ্টীয় এবং অন্যগুলো মিশ্র বা মিক্সড প্রকৃতির হয়ে থাকে।

- সেনসরি স্নায়ু (Sensory nerve): যে সব স্নায়ু কোনো সংবেদী অঙ্গ থেকে উদ্দীপনা বহন করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয় তাদের সংবেদী বা সেনসরি স্নায়ু (sensory nerve) বা অ্যাফারেন্ট নার্ভ (afferent nerves) বলে। যেমন- অলফ্যাক্টরি ও অপটিক স্নায়ু।
- মোটর স্নায়ু (Motor nerve): যে সব স্নায়ু কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোনো নির্দেশ বহন করে নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গে পৌঁছে দেয় তাদের চেষ্টীয় বা আজ্ঞাবাহী বা মোটর স্নায়ু (motor nerve) বা ইফারেন্ট নার্ভ (efferent nerves) বলে। যেমন-অকুলোমোটর ও ট্রকলিয়ার স্নায়ু।
- মিক্সড স্নায়ু (Mixed nerve): কিছু স্নায়ু সংবেদী এবং আজ্ঞাবাহী উভয় ধরনের কাজ করে, এদের মিশ্র বা মিক্সড স্নায়ু (mixed nerve) বলে। যেমন-ফ্যাসিয়াল ও ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু।

মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহের নাম, উৎপত্তি স্থান, শাখা, বিস্তার ও কাজ

I. অলফ্যাক্টরি (Olfactory): এটি সেরেব্রামের অলফ্যাক্টরি লোব হতে উৎপত্তি লাভ করে নাসিকা গহ্বরের মিউকাস পর্দায় বিস্তৃত হয়। এটি সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ: ঘ্রাণ সংবেদ বহন করা এর প্রধান কাজ।

II. অপটিক (Optic): এটি অগ্রমস্তিষ্কের অপটিক লোব হতে উৎপত্তি লাভ করে X আকৃতির আড়াআড়ি কায়াজমা সৃষ্টি করে চোখের রেটিনাতে বিস্তৃত হয়। এটি সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু।

CS CamScanner

কাজঃ দর্শন সংবেদ বহন করা এর প্রধান কাজ।

III. অকুলোমোটর (Oculomotor): এটি মধ্যমস্তিষ্কের অঙ্ক-পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে চক্ষুপেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি আজ্ঞাবাহী প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজঃ এটি চক্ষুপেশির সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

IV. ট্রকলিয়ার (Trochlear): এটি মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে চক্ষুপেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি আজ্ঞাবাহী প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজঃ এটি চক্ষুপেশির সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

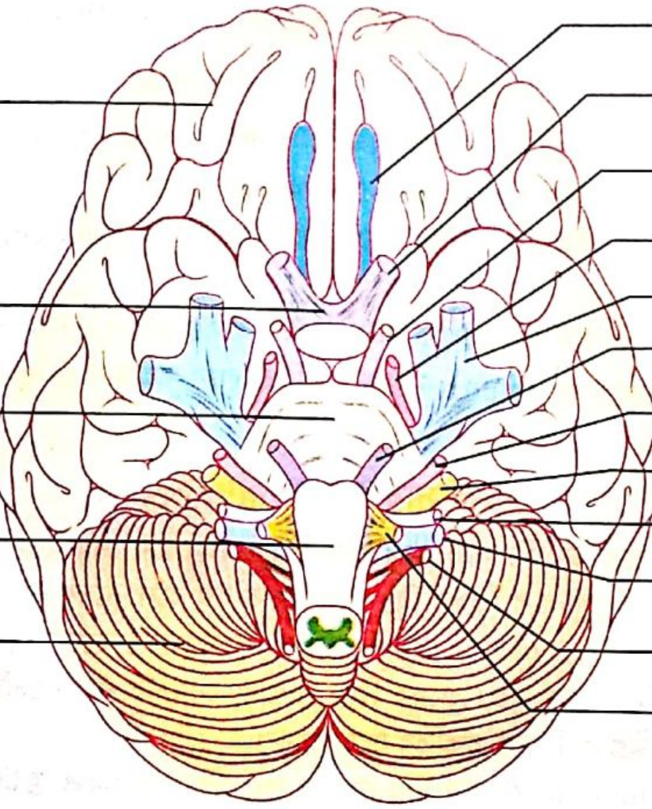

চিত্র ৮.১৩ মস্তিষ্ক হতে বিভিন্ন করোটিক স্নায়ুর উৎপত্তি

V. ট্রাইজেমিনাল (Trigeminal): এটি মেডুলা অবলঙ্গটার পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন অঙ্গে গমণ করে, যেমন-

(ক) অপথ্যালমিক (Opthalmic): এটি অক্ষিপল্লব ও নাসিকার মিউকাস প্রাচীরে বিস্তৃত হয়। এটি সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু। এটি চক্ষুপল্লব ও নাসিকার মিউকাস প্রাচীর থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।

(খ) ম্যাক্সিলারি (Maxillary): এটি অক্ষিপল্লব, উর্ধ্ব ও নিম্নচোয়ালে বিস্তৃত হয়। এটি সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু। এটি অক্ষিপল্লব উর্ধ্ব ও নিম্নচোয়াল থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।

(গ) ম্যান্ডিবুলার (Mandibular): এটি মুখবিবরের অঙ্কীয়দেশের পেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। এটি নিম্ন চোয়ালের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাপ, চাপ ও স্পর্শ সংবেদ বহন মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।

VI. অ্যাবডুসেন্স (Abducens): এটি মেডুলা অবলঙ্গাটার পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে চক্ষুপেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজঃ এটি চক্ষুপেশির সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

CamScanner

একনজরে মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহের নাম, শাখা, প্রকৃতি, বিস্তৃতি ও কাজ

ক্রমিক	নাম	শাখা	প্রকৃতি	বিস্তৃতি	কাজ
I	অলফ্যাক্টরি	-	সংবেদী	নাসিকা গহ্বর	ঘ্রাণ সংবেদ বহন
II	অপটিক	-	সংবেদী	চোখের রেটিনা	দর্শন সংবেদ বহন
III	অকুলোমোটর	-	চেষ্টীয়	চক্ষুপেশি	চক্ষুপেশির সঞ্চালন
IV	ট্রকলিয়ার	-	চেষ্টীয়	চক্ষুপেশি	চক্ষুপেশির সঞ্চালন
V	ট্রাইজেমিনাল	অপথ্যালমিক	সংবেদী	অক্ষিপল্লব, নাসিকা	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে প্রেরণ
		ম্যাক্সিলারি	সংবেদী	উর্ধ্ব ও নিম্নচোয়াল	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে প্রেরণ
		ম্যান্ডিবুলার	মিশ্র	মুখবিবরের অঙ্কীয় পেশি	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সঞ্চালন এবং তাপ, চাপ ও স্পর্শ সংবেদ বহন
VI	অ্যাবডুসেন্স	-	চেষ্টীয়	চক্ষুপেশি	চক্ষুপেশির সঞ্চালন
VII	ফ্যাসিয়াল	প্যালেটাইন	সংবেদী	মুখবিবরের ছাদ	স্বাদ গ্রহণ
		হায়োম্যান্ডিবুলার	মিশ্র	মুখবিবর ও নিম্নচোয়াল	স্বাদ গ্রহণ ও গ্রীবা সঞ্চালন
VIII	অডিটরি	-	সংবেদী	অন্তঃকর্ণ	শ্রবণ সংবেদ গ্রহণ ও ভারসাম্য রক্ষা
IX	গ্লসোফ্যারিন-জিয়াল	-	মিশ্র	জিহ্বা ও গলবিল	স্বাদগ্রহণ ও গলবিল সঞ্চালন
X	ভেগাস	ল্যারিঞ্জিয়াল	মিশ্র	স্বরযন্ত্র	স্বরযন্ত্রের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে
		কার্ডিয়াক	মিশ্র	হৃৎপিণ্ড	হৃৎপিণ্ডের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে
		গ্যাস্ট্রিক	মিশ্র	পাকস্থলি	পাকস্থলির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে
		পালমোনারি	মিশ্র	ফুসফুস	ফুসফুসের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে
XI	স্পাইনাল অ্যাকসেসরি	-	চেষ্টীয়	গলবিল, স্বরযন্ত্র ও গ্রীবা	মাথা ও কাধের পেশি সঞ্চালন
XII	হাইপোগ্লোসাল	-	চেষ্টীয়	জিহ্বা ও গ্রীবা	জিহ্বার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে

মানুষের 12 জোড়া করোটিক স্নায়ুর নাম ধারাবাহিকভাবে স্মরণ রাখা বেশ কঠিন। একটি ইংরেজি বাক্য মনে রাখলে করোটিক স্নায়ুসমূহের নাম স্মরণ রাখা সহজ হবে, যেমন-

On occaasions of training the attractive faces are greatly valued and highlighted.
(OOO-TTA-FAG-VAH)

VII. ফ্যাসিয়াল (Facial): এটি মেডুলা অবলঙ্গাটার পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন অঙ্গে গমণ করে, যেমন-

(ক) প্যালেটাইন (Palatine): এটি মুখবিবরের ছাদে বিস্তৃত হয়। এটি সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু। এটি স্বাদ গ্রহণ করে।

(খ) হায়োম্যান্ডিবুলার (Hayomandibular): এটি মুখবিবর ও নিম্নচোয়ালে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। এটি স্বাদ গ্রহণ ও গ্রীবা সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

VIII. অডিটরি (Auditory): এটি মেডুলা অবলঙ্গাটার পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে অন্তঃকর্ণে বিস্তৃতি লাভ করে। এটি সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু।

CamScanner

কাজ: এটি শ্রবণ সংবেদ গ্রহণ ও ভারসাম্য রক্ষা করে।

IX. গ্লসোফ্যারিনজিয়াল (Glossopharyngeal): এটি মেডুলা অবলঙ্গাটার পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে জিহ্বা ও গলবিলে বিস্তৃতি লাভ করে। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। এটি স্বাদ গ্রহণ ও গলবিল সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

X. ভেগাস (Vagus): এটি মেডুলা অবলঙ্গাটার পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে চারটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন অঙ্গে গমণ করে, যেমন-

(ক) ল্যারিঞ্জিয়াল (Laryngeal): এটি স্বরযন্ত্রে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। এটি স্বরযন্ত্রের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) কার্ডিয়াক (Cardiac): এটি হৃৎপিণ্ডে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। এটি হৃৎপিণ্ডের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

(গ) গ্যাস্ট্রিক (Gastric): এটি পাকস্থলিতে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। এটি পাকস্থলির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঘ) পালমোনারি (Pulmonary): এটি ফুসফুসে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। এটি ফুসফুসের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

XI. স্পাইনাল অ্যাকসেসরি (Spinal Accessory): এটি মেডুলা অবলঙ্গাটার মেঝে হতে উৎপত্তি লাভ করে গলবিল, স্বরযন্ত্র ও গ্রীবা অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। এটি একটি চেষ্টীয় প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ: এটি সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহের পেশি সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

XII. হাইপোগ্লোসাল (Hypoglossal): এটি মেডুলা অবলঙ্গাটার পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে জিহ্বা ও গ্রীবা অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। এটি একটি চেষ্টীয় প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ: এটি জিহ্বার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে লম্বা ও প্রায় চোঙাকৃতির অংশ মস্তিষ্কের মেডুলা অবলঙ্গাটার পশ্চাৎ অংশ হতে সৃষ্ট হয়ে মেরুদণ্ডের পৃষ্ঠদেশের নিউরাল নালির মধ্য দিয়ে লাম্বার অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত থাকে তাকে সুষুম্নাকাণ্ড বলে। এটি পুরুষের ক্ষেত্রে প্রায় 45 সেন্টিমিটার ও মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রায় 42 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হয়। সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থ অঞ্চল ভিত্তিক ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন-সার্ভাইক্যাল ও লাম্বার অঞ্চলে এটি 13 মিমি এবং থোরাসিক অঞ্চলে এটি 6.4 মিমি প্রস্থ বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

এর সম্মুখ-পৃষ্ঠভাগে একটি 3 মিমি গভীর খাঁজ থাকে। একে অ্যান্টেরিয়র মিডিয়ান ফিশার (anterior median fissure) বলে। এটি সুষুম্নাকাণ্ডের পশ্চাৎদিকে ক্রমশ অগভীর হয়ে যায়। তখন একে পস্টেরিয়র মিডিয়ান সালকাস (posterior median sulcus) বলে। প্রথম ও দ্বিতীয় লাম্বার কশেরুকার সংযোগ স্থলে এসে সুষুম্নাকাণ্ড হঠাৎ সরু হয়ে যায়। একে কোনাস মেডুলারিস (conus medullaris) বলে।

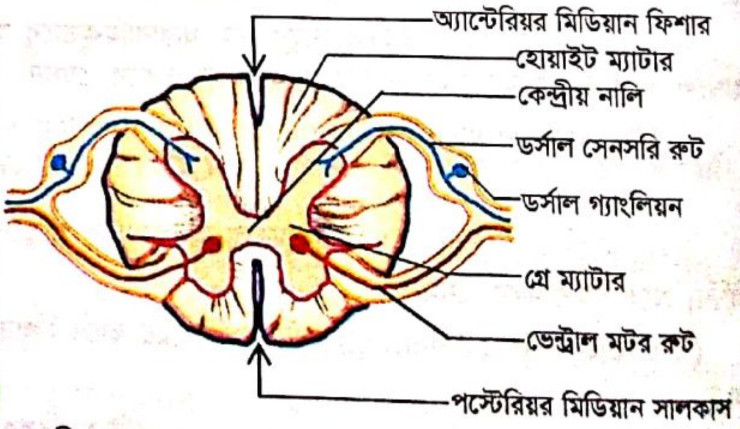

চিত্র : ৮.১৪ মানুষের সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ

কোনাস মেডুলারিস থেকে সুষুম্নাকাণ্ডের পরবর্তী অংশ সূক্ষ্ম তন্তুর মতো। একে ফিলিয়াম টার্মিনালি (filium terminale) বলে। এটি নন-নিউরাল প্রকৃতির এবং কক্কিক্স পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। মস্তিষ্কের মতো সুষুম্নাকাণ্ড বাইরের

CS CamScanner

দিকে মেনিনজেস দ্বারা পরিবৃত্ত থাকে। সুষুম্নাকাণ্ডের অভ্যন্তরে মস্তিষ্কের গহ্বর প্রসারিত থাকে। এক্ষেত্রে একে সেন্ট্রাল ক্যানাল বা কেন্দ্রীয় নালি (central canal) বলে। এ নালিতে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড বিদ্যমান থাকে। সুষুম্নাকাণ্ডের ভেতরের অংশ গ্রে ম্যাটার ও বাইরের অংশ হোয়াইট ম্যাটার দিয়ে গঠিত। গ্রে ম্যাটার সুষুম্নাকাণ্ডের ভেতরে ইংরেজি H এর মতো বিস্তৃত থাকে। এটি স্নায়ুকোষ, নিউরোগ্লিয়া এবং রক্তনালি সমৃদ্ধ। গ্রে ম্যাটারের চারদিকে হোয়াইট ম্যাটার বিস্তৃত থাকে। এটি স্নায়ুতন্তু, নিউরোগ্লিয়া ও রক্তনালি নিয়ে গঠিত।

সুষুম্নাকাণ্ডের কাজ

১। সুষুম্না স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের মধ্যে সকল ধরনের সংবেদ আদান-প্রদান সুষুম্নাকাণ্ডের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।
২। এটি হাঁটা-চলার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।
৩। এটি হাত ও পায়ে সৃষ্ট যে কোনো প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
৪। এটি ব্যথা, চাপ ও তাপ অনুভূতি গ্রহণে সহায়তা করে।

সুষুম্না স্নায়ু (Spinal nerves): সুষুম্নাকাণ্ড থেকে সৃষ্ট মিশ্র প্রকৃতির যেসব স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ড ও দেহের মধ্যে আজ্ঞাবাহী, সংবেদী ও স্বয়ংক্রিয় উদ্দীপণা বহন করে তাদের সুষুম্না স্নায়ু বলে। মোট 31 জোড়া স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে। এদের মধ্যে 8 জোড়া মেরুদণ্ডের সারভাইক্যাল অঞ্চলে, 12 জোড়া থোরাসিক অঞ্চলে, 5 জোড়া লাম্বার অঞ্চলে, 5 জোড়া স্যাক্রাল অঞ্চলে এবং 1 জোড়া কক্কিজিয়াল অঞ্চলে থাকে। সকল সুষুম্না স্নায়ুই মিশ্র প্রকৃতির। প্রতিটি স্নায়ু একটি ডর্সাল সেনসরি রুট (dorsal sensory root) এবং একটি ভেন্ট্রাল মটর রুট (ventral motor root) দ্বারা সুষুম্নাকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে। প্রতিটি ডর্সাল রুটের সাথে একটি ডর্সাল গ্যাংলিয়ন যুক্ত থাকে। প্রান্তের দিকে প্রতিটি সুষুম্না স্নায়ু দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পেশিতে গমন করে।

মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য

মস্তিষ্ক	সুষুম্নাকাণ্ড
১। এটি করোটিকার মধ্যে অবস্থান করে।	১। এটি মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থান করে।
২। এটি স্ফীত ও ডিম্বাকৃতির।	২। এটি লম্বা ও প্রায় চোঙাকৃতির।
৩। বাইরের দিকে থেকে এটি সালকি ও গাইরি ফিশার দ্বারা বিভক্ত থাকে।	৩। এটি বাইরের দিক থেকে অ্যান্টেরিয়র ও পস্টেরিয়র ফিশার দ্বারা বিভক্ত থাকে।
৪। মস্তিষ্ক হতে 12 জোড়া স্নায়ু সৃষ্টি হয়।	৪। সুষুম্নাকাণ্ড থেকে 31 জোড়া স্নায়ু সৃষ্টি হয়।
৫। এটি দেহের সকল যান্ত্রিক, জৈব রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।	৫। এটি সুষুম্না স্নায়ু ও মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

করোটিক স্নায়ু ও সুষুম্না স্নায়ুর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	করোটিক স্নায়ু	সুষুম্না স্নায়ু
১। উৎপত্তি স্থান	মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ	সুষুম্নাকাণ্ড
২। সংখ্যা	12 জোড়া	31 জোড়া
৩। স্নায়ুমূল	1টি	2টি
৪। নির্গমণ	করোটিকার ছিদ্রপথে নির্গমিত হয়	আন্তঃকশেরুকার ছিদ্র দিয়ে নির্গমিত হয়
৪। প্রকৃতি	সংজ্ঞাবাহী, আজ্ঞাবাহী অথবা মিশ্র প্রকৃতির	সকলেই মিশ্র প্রকৃতির
৫। বিশেষত্ব	অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ	কম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

CamScanner

৮.৪ মানব সংবেদী অঙ্গ

যেসব অঙ্গের মাধ্যমে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপনা গ্রহণ করে তাদের সংবেদী অঙ্গ বলে। মানবদেহে প্রায় 11 ধরনের সংবেদ গ্রাহক আছে। এদের মধ্যে পাঁচ ধরনের অঙ্গকে বিশেষ সংবেদ অঙ্গ (organs of special sense) পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলা হয়। এগুলো হলো: দর্শন (vision), শ্রবণ (hearing), ঘ্রাণ (smell), স্বাদ (taste) এবং ভারসাম্য (equilibrium) রক্ষাকারী অঙ্গ। প্রাণিজগতের মধ্যে মানুষে এসব অঙ্গ অতি বিকশিত হওয়ার কারণেই মানুষ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে টিকে আছে। এপুস্তকে কেবল মানুষের দর্শন এবং শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষাকারী সংবেদী অঙ্গের বর্ণনা করা হয়েছে।

চোখ: আলোকসংবেদী ও দর্শন অঙ্গ (Eyes: Photoreceptor and Vision organs)

চোখ মানুষের আলোকসংবেদী অঙ্গ বা দর্শনেন্দ্রীয়। মাথার সম্মুখদিকে দুপাশে দুটি চোখ বিদ্যমান। করোটির অপটিক ক্যাপসুলে (optic capsule) প্রতিটি চোখ বসানো থাকে। মানুষের প্রতিটি চোখে নিম্নলিখিত অংশগুলো থাকে-

(১) চক্ষু পল্লব, (২) চক্ষুপেশি, (৩) চক্ষু গ্রন্থি এবং (৪) চক্ষু গোলক ।

নিম্নে চোখের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ বর্ণনা করা হলো:

১। চক্ষু পল্লব (Eye lids): প্রতিটি চোখের উপরে ও নিচে পেশিবহুল, পাতার মতো দুটি পর্দা থাকে। এদের চক্ষু পল্লব বলে। এদের কিনারায় লোম বিদ্যমান। এ লোমগুলোকে চোখের পাঁপড়ি (eye lashes) বলে। চোখের সম্মুখ কোণে ভাঁজ খাওয়া গোলাকৃতির লোমবিহীন একটি মাংসল অংশ থাকে। একে প্লিকা সেমিলুনারিস (plica semilunaris) বা নিকটিটেটিং পর্দা (nictitating membrane) বা তৃতীয় চক্ষু পল্লব বলে।

কাজ: চক্ষু পল্লব চোখকে খোলা রাখে বা বন্ধ করে। এরা ধূলোবালি, তীব্র আলো, পানি, বাতাস ও আঘাত হতে চোখকে রক্ষা করে। এরা চোখের অশ্রুর প্রলেপ ও অশ্রু প্রবাহ রক্ষা করে।

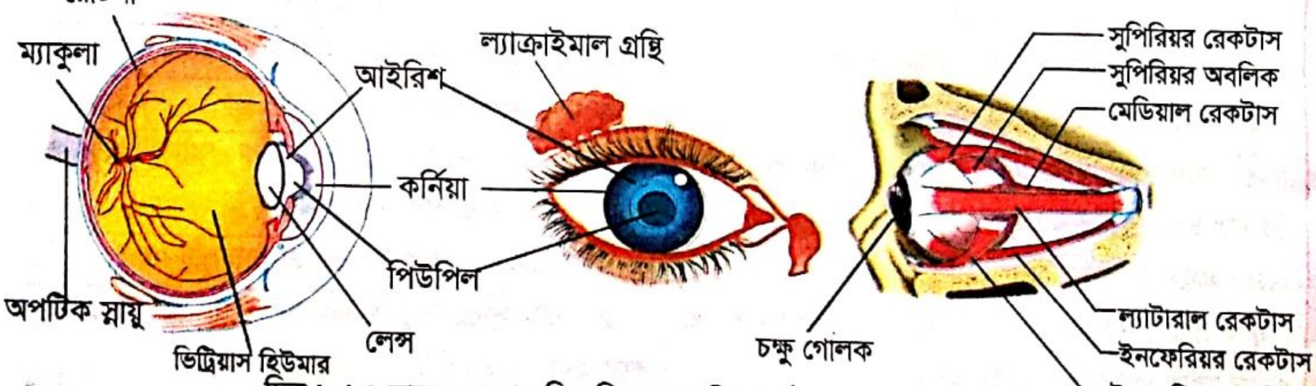

চিত্র ৮.১৫ মানব চোখের ত্রিমাত্রিক ও বাহ্যিক গঠন এবং চোখের পেশি

২। চক্ষুপেশি (Eye muscles): ছয়টি ভিন্ন ধরনের পেশি দিয়ে প্রতিটি চক্ষু গোলক চক্ষুকোটরে সংযুক্ত থাকে। পেশিগুলোর মধ্যে 4টি রেকটাস পেশি এবং 2টি অবলিক পেশি। এসব পেশিতে করোটিক স্নায়ু প্রসারিত থাকে। মানুষের চোখের পেশিগুলো হলো:

- **মেডিয়াল রেকটাস** (Medial rectus): চক্ষু গোলককে চক্ষুকোটরের ভেতরের দিকে ঘুরতে সহায়তা করে।
- **ল্যাটারাল রেকটাস** (Lateral rectus): চক্ষু গোলককে চক্ষুকোটরের বাইরের দিকে ঘুরতে সহায়তা করে।
- **সুপিরিয়র রেকটাস** (Superior rectus): চক্ষু গোলককে চক্ষুকোটরের উপরের দিকে ঘুরতে সহায়তা করে।
- **ইনফিরিয়র রেকটাস** (Inferior rectus): চক্ষু গোলককে চক্ষুকোটরের নিচের দিকে ঘুরতে সহায়তা করে।
- **সুপিরিয়র অবলিক** (Superior oblique): চক্ষু গোলককে অপটিক স্নায়ু-কর্নিয়ার অক্ষ বরাবর ঘুরতে সহায়তা করে।

CamScanner

❑ ইনফিরিয়র অবলিক (Inferior oblique): চক্ষু গোলককে অবলিক পেশির বিপরীত দিকে ঘুরতে সহায়তা করে।

৩। চক্ষু গ্রন্থি (Eye glands): মানুষের চোখে তিন ধরনের গ্রন্থি থাকে, যথা-

❑ ল্যাক্রাইমাল গ্রন্থি (Lacrimal glands): চক্ষু গোলকের উপরে ও সামনে অবস্থিত।

❑ হার্ডেরিয়ান গ্রন্থি (Harderian glands): চক্ষু গোলকের পশ্চাতে অক্ষীয় দিকে অবস্থিত।

❑ মেবোমিয়ান গ্রন্থি (Meibomian glands) : চক্ষু পল্লবের কোণায় অবস্থিত।

কাজ: ল্যাক্রাইমাল গ্রন্থি নিঃসৃত লোণা ও জীবাণুরোধক তরলকে অশ্রু (tear) বলে। অশ্রু প্রধানত পানি, লবণ, অ্যান্টিবডি ও লাইসোজাইম (ব্যাকটেরিয়ানাশক এনজাইম) নিয়ে গঠিত। এটি চোখকে সিক্ত, পরিচ্ছন্ন ও জীবাণু মুক্ত রাখে। হার্ডেরিয়ান ও মেবোমিয়ান গ্রন্থি নিঃসৃত তৈলাক্ত পদার্থ চক্ষু পল্লব ও কর্নিয়াকে পিচ্ছিল এবং অশ্রুর বাষ্পায়ন রোধ করে। রাখে।

৪। চক্ষু গোলক (Eye ball): চক্ষু গোলকই চোখের মূল অংশ। এটি একটি ক্ষুদ্র ক্যামেরার মতো। এটি চক্ষুকোটরে (orbital cavity) ছয়টি পেশি দ্বারা ঝুলে থাকে এবং এর প্রায় সম্পূর্ণ অংশই দখল করে রাখে। চক্ষু গোলকটি তিন স্তর বিশিষ্ট প্রাচীর এবং তরলপূর্ণ প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত।

চক্ষু গোলক বা মানুষের চোখের গঠন

(ক) চক্ষু গোলকের প্রাচীর (Eye wall)

মানুষের চক্ষু গোলকের প্রাচীর তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত। স্তরগুলো হলো-(১) স্ক্লেরা, (২) কোরয়েড এবং (৩) রেটিনা।

১। স্ক্লেরা (Sclera): চক্ষু গোলক প্রাচীরের সর্ব বাহিরের সাদা বর্ণের স্তরকে স্ক্লেরা বলে। এটি অস্বচ্ছ, মজবুত, স্থিতিস্থাপক ও তন্তুময় যোজক কলা নির্মিত। এর সামনের দিকের এক-ষষ্ঠাংশ স্বচ্ছ ও স্ফীত হয়ে কর্নিয়া (cornea) গঠন করে। কর্নিয়ার উপরের অংশ একটি স্বচ্ছ ও পাতলা স্তর দ্বারা আবৃত থাকে, একে কনজাংটিভা (conjunctiva) বলে। চোখের পশ্চাৎ দিকে যে অংশ দিয়ে অপটিক স্নায়ু প্রবেশ করে স্ক্লেরার সে অংশকে ল্যামিনা ক্রাইবোসা (lamina cribrosa) বলে।

স্ক্লেরার কাজ: স্ক্লেরা চক্ষু গোলকের সমর্থনকারী প্রাচীর গঠন করে এবং এর সকল অংশকে ধারণ করে। এটি চোখের ভেতরের সকল গঠনকে সুরক্ষা দেয় এবং চোখের আকৃতি ঠিক রাখে। এতে চক্ষুপেশিসমূহ সংযুক্ত থাকে। কর্নিয়াকে চোখের জানালা (window of eye) বলা হয় কেননা এর মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি চোখে প্রবেশ করে। কনজাংটিভা চোখকে বাইরের আঘাত, জীবাণুর আক্রমণ হতে রক্ষা করে এবং চোখ পরিষ্কার ও ভেজা রাখে। কনজাংটিভা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে চোখ লাল দেখায়। একে কনজাংটিভাইটিস (conjunctivitis) বলে।

২। কোরয়েড (Choroid): চক্ষু গোলক প্রাচীরের মধ্যবর্তী পরিবাহী (vascular) ও কালো স্তরকে কোরয়েড বলে। এটি যোজক কলা নির্মিত, মেলানিন রঞ্জকে রঞ্জিত, স্নায়ুজালক ও রক্তজালিকা সমৃদ্ধ স্তর। কর্নিয়ার সংযোগস্থল বরাবর কোরয়েড স্ক্লেরা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কর্নিয়ার পেছনে একটি বৃত্তাকার, রঙিন ও সঙ্কোচনশীল ডায়াফ্রাম (diaphragm) গঠন করে। একে আইরিশ (iris) বলে। আইরিশের কেন্দ্রে একটি 3-4 মিলিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট গোলাকার ছিদ্র থাকে, একে পিউপিল (pupil) বলে। পিউপিলের মধ্যদিয়ে আলোক প্রবেশ করে। কোরয়েডের অপর একটি অংশ আইরিশের পেছনে গোলাকার ও স্ফীত একটি অঙ্গ গঠন করে। একে সিলিয়ারি বডি (ciliary body) বলে। সিলিয়ারি বডি থেকে সাসপেনসারি লিগামেন্ট (suspensory ligament) নামক কতগুলো তন্তু একটি দ্বিউত্তল লেন্সকে (biconvex lens) পিউপিলের পেছনে আইরিশ ও ভিট্রিয়াস বডির মাঝে ঝুলিয়ে রাখে। লেন্সটি প্রায় 10 মিলিমিটার ব্যাস ও 3.7-4.5 মিলিমিটার পুরুত্ব বিশিষ্ট। এটি বাইরের দিকে বৃহদাকৃতির কোষের এপিথেলিয়াম স্তর

CS CamScanner

এবং কেন্দ্রের দিকে নিউক্লিয়াসবিহীন ঘন সন্নিবেশিত কোষ দ্বারা গঠিত। লেন্স রক্তসংবহনবিহীন। এটি পার্শ্ববর্তী তরল হতে পুষ্টি গ্রহণ করে।

কোরয়েডের কাজ: কোরয়েডের রক্তজালক থেকে স্ক্লেরা ও রেটিনা পুষ্টি গ্রহণ করে। এটি চোখে প্রবেশকৃত অতিরিক্ত আলোক শোষণ করে। এর আইরিশ চোখের বর্ণ নির্ধারণ করে। চোখের আইরিশ ক্যামেরার ডায়াফ্রামের মতো এবং এর পিউপিল চোখে আলোক প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। কোরয়েডের সিলিয়ারি বডি থেকে অ্যাকুয়াস হিউমার তরল নিঃসৃত হয়। কোনো বস্তু হতে আগত আলোকরশ্মি লেন্সের মাধ্যমে রেটিনায় পতিত হয়।

৩। রেটিনা (Retina): চক্ষু গোলক প্রাচীরের সর্ব ভেতরের স্তরকে রেটিনা বলে। এটি আলোকসংবেদী স্তর এবং 10টি উপস্তর নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে রডকোষ ও কোনকোষ নামক আলোকসংবেদী কোষ নিয়ে গঠিত উপস্তরটি প্রধান। রেটিনার বাইরের দিকে রডকোষ থাকে এবং এরা আলোক ও অন্ধকারে সংবেদনশীল। রেটিনার কেন্দ্রের দিকে কোনকোষ থাকে এবং এরা রঙের প্রতি সংবেদনশীল। মানুষের প্রতি চোখে প্রায় 120×10^6টি রডকোষ এবং প্রায় 7×10^6টি কোনকোষ থাকে। রডকোষ স্বল্প আলোতে এবং কোনকোষ তীব্র আলোতে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। রেটিনার একটি স্থানে অপটিক স্নায়ু সংযুক্ত হয়। এ স্থানকে অন্ধবিন্দু (blind spot) বলে। কারণ এখানে কোনো আলোকসংবেদী কোষ থাকে না। অন্ধবিন্দুর উপরের দিকে একটি ডিম্বাকার ও হলুদ অঞ্চল বিদ্যমান। একে পীত বিন্দু (yellow spot) বা ফোবিয়া সেন্ট্রালিস (fovea centralis) বলে। মানব চোখের পীত বিন্দুতে সবচেয়ে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

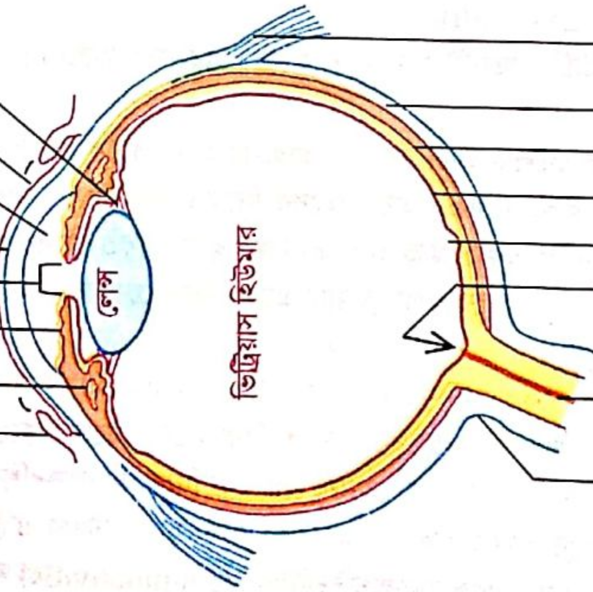

চিত্র ৮.১৬ মানব চোখের লম্বচ্ছেদ

রেটিনার কাজ রেটিনার কারণে দিনের আলোয় কিংবা রাতের আধারে বস্তুর রঙিন ও স্টেরিওস্কোপিক বা ত্রিমাত্রিক দর্শন সম্ভব হয়। রেটিনাতে বস্তুর সঠিক দর্শন ও অবস্থা পরিবর্তন অনুধাবন সম্পন্ন হয়। রেটিনা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সাথে জড়িত।

(খ) চক্ষু গোলক প্রকোষ্ঠ (Eye chamber)

চক্ষু গোলকে তিনটি প্রকোষ্ঠ থাকে। যেমন-

১। অগ্র প্রকোষ্ঠ (Anterior chamber): এটি আইরিশ ও কর্নিয়ার মাঝে অবস্থিত মাঝারি আকৃতির প্রকোষ্ঠ। এ প্রকোষ্ঠটি অ্যাকুয়াস হিউমার (aquous humour) নামক তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। অ্যাকুয়াস হিউমার তরল অনেকটা সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের মতো।

CamScanner

২। পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ (Posterior chamber): এটি লেন্স ও আইরিশের মাঝে অবস্থিত ক্ষুদ্রাকৃতির প্রকোষ্ঠ। এ প্রকোষ্ঠটিও অ্যাকুয়াস হিউমার তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে।

৩। ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠ (Vitreous chamber): এটি লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী গোলাকৃতির বৃহৎ প্রকোষ্ঠ। এটি চোখের চার-পঞ্চমাংশ গঠন করে। এটি ভিট্রিয়াস হিউমার (vitreous humour) নামক জেলির মতো তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। ভিট্রিয়াস হিউমারের 99% পানি এবং 1% কোলাজেন ও হায়ালোরোনিক অ্যাসিড। ভিট্রিয়াস হিউমার থেকে রেটিনার উপরে একটি সূক্ষ্ম ও রঙিন এপিথেলিয়াম স্তর সৃষ্টি হয়।

চক্ষু গোলেকের কাজ: চক্ষু গোলকের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিদ্যমান তরল–(i) চোখের সঠিক আকৃতি বজায় রাখে; (ii) চোখের অন্তঃচাপ ও বহিঃচাপ নিয়ন্ত্রণ করে; (iii) আলোকরশ্মি প্রতিসরণ করে; (iv) রেটিনা ও লেন্সে পুষ্টি যোগায়।

রডকোষ ও কোনকোষ (Rod cell and Cone cell)

মানব চক্ষু গোলক প্রাচীরের রেটিনা স্তরে দুধরনের আলোকসংবেদী কোষ থাকে। এগুলো হলো রডকোষ ও কোনকোষ। রডকোষগুলো লম্বা, সরু এবং রেটিনাতে উলম্বভাবে অবস্থান করে। প্রতিটি রডকোষ 2 মাইক্রোমিটার পুরু এবং 50 মাইক্রোমিটার লম্বা। অন্যদিকে কোনকোষগুলো রডকোষ অপেক্ষা কিছুটা খাটো ও প্রশস্ত। প্রতিটি কোনকোষ 3-5 মাইক্রোমিটার পুরু এবং 40 মাইক্রোমিটার লম্বা। রেটিনাতে তিন ধরনের কোনকোষ থাকে যারা ভিন্ন ধরনের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা বর্ণের প্রতি সংবেদনশীল। ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোনকোষ নীল বর্ণ, মধ্যম তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোনকোষ সবুজ বর্ণ এবং দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোনকোষ লাল বা হলুদ বর্ণ অনুধাবন করে।

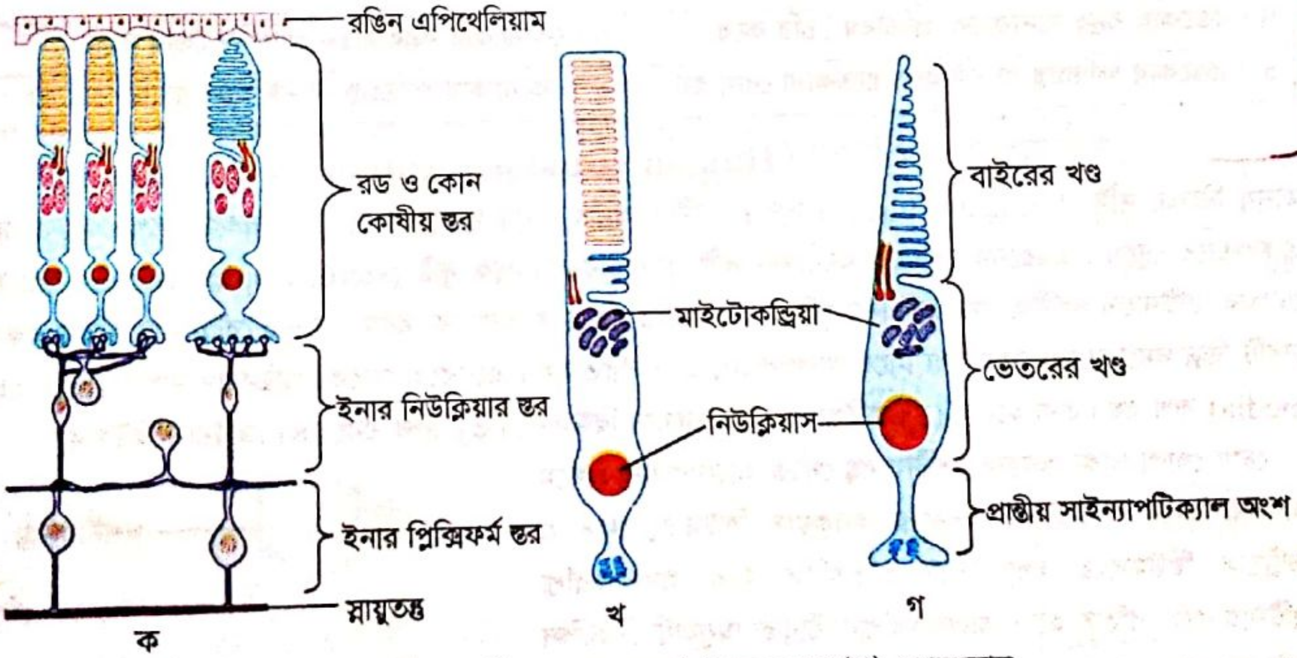

চিত্র ৮.১৭ (ক) রেটিনার প্রস্থচ্ছেদ (খ) রডকোষ (গ) কোনকোষ

গাঠনিক দিক থেকে রডকোষ ও কোনকোষ প্রায় একই রকম। এদের প্রতিটি কোষ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। অংশগুলো হলো- (১) বাইরের খণ্ড, (২) ভেতরের খণ্ড এবং (৩) প্রান্তীয় সাইন্যাপটিক্যাল অংশ। রডকোষগুলোর বাইরের খণ্ড রড (rod) আকৃতির। এতে রডোপসিন (rhodopsin) নামক আলোকসংবেদী রঞ্জক পদার্থ এবং ভিটামিন A থাকে। কোনকোষগুলোর বাইরের খণ্ড কোন (cone) আকৃতির। এতে আয়োডপসিন (iodopsin) নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে। উভয় কোষের ভেতরের খণ্ডে প্রচুর পরিমাণে মাইটোকন্ড্রিয়া ও অন্যান্য কোষীয় অঙ্গাণু থাকে। কোষসমূহের প্রান্তীয় সাইন্যাপটিক্যাল অংশ স্ফীত হয়ে বাল্ব গঠন করে যা দ্বিমেরু নিউরনের সাথে সিন্যাপস গঠন করে।

রডকোষ ও কোনকোষ-এর মধ্যে পার্থক্য

রডকোষ	কোনকোষ
১। রেটিনার বাইরের দিকে রডকোষ থাকে।	১। রেটিনার কেন্দ্রের দিকে কোনকোষ থাকে।
২। রডকোষ লম্বা ও সরু, 2 মাইক্রোমিটার পুরু এবং 50 মাইক্রোমিটার লম্বা।	২। কোনকোষ খাটো ও প্রশস্ত, 3-5 মাইক্রোমিটার পুরু এবং 40 মাইক্রোমিটার লম্বা।
৩। রডকোষ কেবল এক ধরনের।	৩। কোন কোষ তিন ধরনের।
৪। রডকোষ প্রতিচোখে প্রায় 120×10^6টি, ফোবিয়া ছাড়া অন্যত্র সমভাবে বিস্তৃত।	৪। কোনকোষ প্রতিচোখে প্রায় 7×10^6টি, ফোবিয়াতে অধিক ঘনত্বে এবং অন্যত্র হালকাভাবে বিস্তৃত।
৫। রডকোষের বাইরের খণ্ড রড (rod) আকৃতির এবং বিপুল পরিমাণ রডোপসিন নামক রঞ্জক পদার্থ সমৃদ্ধ।	৫। কোনকোষের বাইরের খণ্ড কোন (cone) আকৃতির এবং অল্প পরিমাণ আয়োডপসিন নামক রঞ্জক পদার্থ সমৃদ্ধ।
৬। রডকোষ স্তিমিত আলোতে অধিক সংবেদনশীল, রাতের দর্শনে ব্যবহৃত হয়। একে স্ক্যাটোপিক দর্শন বলে।	৬। কোনকোষ উজ্জ্বল আলোতে অধিক সংবেদনশীল, দিনের দর্শনে ব্যবহৃত হয়। একে ফটোপিক দর্শন বলে।
৭। রডকোষ বস্তুর সাদাকালো প্রতিবিম্ব তৈরি করে।	৭। কোনকোষ বস্তুর রঙিন প্রতিবিম্ব তৈরি করে।
৮। রডকোষ ক্ষতিগ্রস্থ বা নষ্ট হলে রাতকানা রোগ হয়।	৮। কোনকোষ ক্ষতিগ্রস্থ বা নষ্ট হলে বর্ণান্ধ রোগ হয়।

মানুষের দর্শন কৌশল (Human visual perception mechanism)

মানুষ দ্বিনেত্র দৃষ্টি (binocular vision) সম্পন্ন প্রাণী। অর্থাৎ মানুষ দুচোখের সাহায্যে একই সাথে কোনো বস্তুকে এককভাবে দেখে। এধরনের দর্শনকে ঘণবীক্ষন দৃষ্টি বা স্টেরিওস্কোপিক দৃষ্টি (stereoscopic vision) বলা হয়। চোখের রেটিনাতে দর্শনীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। দর্শনীয় বস্তু হতে আলোক তরঙ্গ সরাসরি রেটিনাতে পতিত হয় না। চারটি ভিন্ন ঘনত্বের মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি প্রতিসরিত হয়। এদেরকে চোখের প্রতিসরণ মাধ্যম (refractive media) বলা হয়। এরা হলো- (১) কর্নিয়া, (২) অ্যাকুয়াস হিউমার, (৩) লেন্স এবং (৪) ভিট্রিয়াস হিউমার।

চোখ খোলা থাকা অবস্থায় দর্শনীয় বস্তু থেকে আলোকরশ্মি প্রথমে কর্নিয়ার উপর পতিত হয়। এরপর অ্যাকুয়াস হিউমার, লেন্স ও ভিট্রিয়াস হিউমারের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে আলোকরশ্মি রেটিনায় এসে পতিত হয়। আলোকরশ্মির তীব্রতা অনুযায়ী পিউপিল ছোট-বড় হয় এবং বস্তুর দুরত্ব অনুযায়ী লেন্সের বক্রতার পরিবর্তন ঘটে। আপতিত আলোকরশ্মি লেন্সের মধ্যদিয়ে প্রতিসৃত হওয়ার সময় অভিসারী রশ্মিরূপে রেটিনার উপর প্রতিফলিত হয়। ফলে রেটিনাতে বস্তুটির ছোট ও উল্টা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।

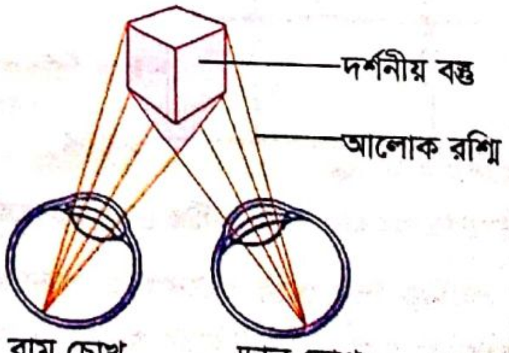

চিত্র ৮.১৮ মানুষের দ্বিনেত্র দর্শন কৌশল

রেটিনায় বিদ্যমান আলোকসংবেদী রডকোষ ও কোনকোষসমূহ আলোক দ্বারা উদ্দীপিত হয় এবং এ আলোক অনুভূতি অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের দৃষ্টি কেন্দ্রে পৌছায়। মস্তিষ্কের কার্যকারিতায় বস্তুর উল্টা প্রতিবিম্ব সোজা হয়ে দৃষ্টিগোচর হয়।

মানুষের দ্বিনেত্র দৃষ্টি থাকার সুবিধা-

১। দুচোখের সাহায্যে একই সাথে কোনো বস্তুকে এককভাবে দেখে।

২। কোনো বস্তুকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারে।

৩। দৃষ্টিক্ষেত্র অনেক বড় হয়।

৪। চোখের রেটিনাতে অন্ধবিন্দু থাকার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়।

৫। বস্তু ও চোখের মধ্যবর্তী দূরত্বকে সূক্ষ্মভাবে মূল্যায়ন করতে পারে।

৬। বিভিন্ন কাজ সুনিপূনভাবে ব্যবস্থাপনা করতে পারে।

উপযোজন (Accommodation)

কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণী দর্শনীয় বস্তু ও চোখের মধ্যবর্তী দূরত্ব অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখার জন্য চোখে যে বিশেষ ধরনের পরিবর্তন ঘটায় তাকে উপযোজন বলে। মানুষ দুচোখকে একই বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করে, লেন্সের বক্রতার পরিবর্তন করে এবং পিউপিলের সঙ্কোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে উপযোজন সম্পন্ন করে। চোখের আইরিশ, সিলিয়ারি পেশি, সাসপেনসরি লিগামেন্ট ও লেন্স সক্রিয়ভাবে উপযোজনে অংশগ্রহণ করে। উপযোজনের সময় চোখে যেসব পরিবর্তন ঘটে সেগুলো হলো-

❑ দুচোখের সমকেন্দ্রীকরণ; ❑ সিলিয়ারি পেশির সঙ্কোচন-প্রসারণ; ❑ সাসপেনসরি লিগামেন্টের সঙ্কোচন-প্রসারণ; ❑ লেন্সের আকারের পরিবর্তন; ❑ চক্ষু গোলকের ঘূর্ণন; ❑ চোখের প্রতিসরণ ক্ষমতার বৃদ্ধিকরণ এবং ❑ পিউপিলের সঙ্কোচন-প্রসারণ।

উপযোজন কৌশল

কাছে ও দূরের বস্তু দেখার জন্য মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ীতে দুভাবে উপযোজন সংঘটিত হয়। যথা -

১। **কাছের বস্তুর দর্শন প্রক্রিয়া:** চোখের সন্নিকটের কোনো বস্তুকে দর্শন করার সময় সিলিয়ারি বডিতে বিদ্যমান বৃত্তাকার পেশি সঙ্কোচিত হয় এবং সাসপেনসরি লিগামেন্ট প্রসারিত হয়। এতে লেন্সের বক্রতা বেড়ে গিয়ে তা মোটা ও খাটো হয় এবং এর ফোকাস দূরত্ব কমে যায়। ফলে কাছের বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মি রেটিনায় পতিত হয়ে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করে।

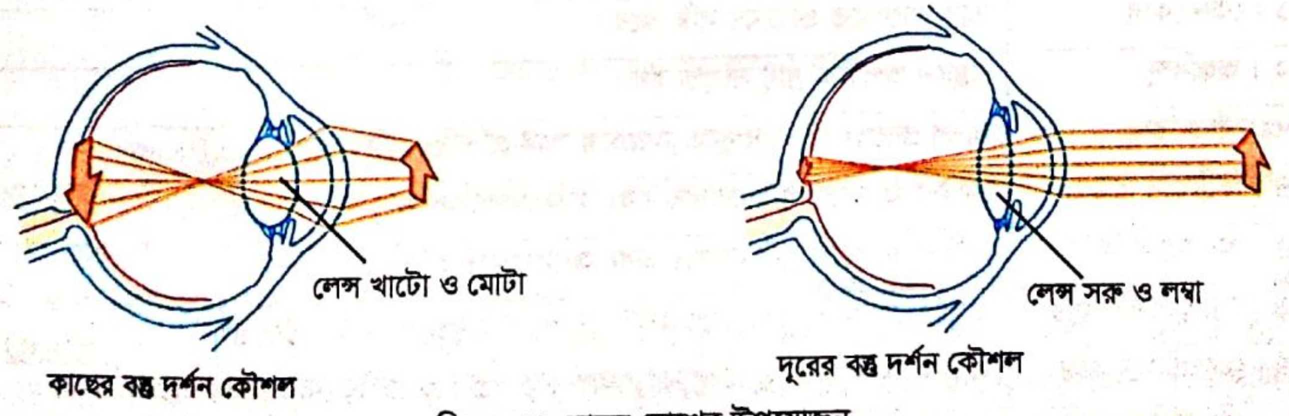

চিত্র ৮.১৯ মানব চোখের উপযোজন

২। **দূরের বস্তুর দর্শন প্রক্রিয়া:** চোখ থেকে দূরে অবস্থিত কোনো বস্তুকে দেখার সময় সিলিয়ারি বডিতে বিদ্যমান বৃত্তাকার পেশি প্রসারিত হয় এবং সাসপেনসরি লিগামেন্ট সঙ্কোচিত হয়। এতে লেন্সের বক্রতা কমে গিয়ে উহা সরু ও লম্বা হয় এবং এর ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যায়। ফলে দূরের বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মি রেটিনায় পতিত হয়ে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

CamScanner

মানব চোখের সীমাবদ্ধতা (Limitation of human eye)

১। মানব চোখের আকৃতি সুনির্দিষ্ট, তাই এর আলোক গ্রহণ ক্ষমতা সীমিত থাকে।

২। এটি সুনির্দিষ্ট আলোক তীব্রতায় সাড়া দেয় এবং কেবল দৃশ্যমান তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি দেখতে পায়।

৩। চোখ প্রতি মূহুর্তে বস্তুর নতুন প্রতিবিম্ব দেখে।

৪। এটি কোনো বস্তুর অস্পষ্ট প্রতিবিম্বকে আলোর তীব্রতা বাড়িয়ে স্পষ্ট করতে পারে না।

৫। চোখ ক্যামেরার মতো কোনো বস্তুর প্রতিবিম্বকে সংরক্ষণ করতে পারে না।

এক নজরে মানবচোখের বিভিন্ন অংশের প্রধান কাজ

চোখের অংশ	প্রধান কাজ
১। স্ক্লেরা	চক্ষু গোলকের সমর্থনকারী প্রাচীর গঠন করে এবং এর সকল অংশকে ধারণ করে।
২। কর্নিয়া	একে চোখের জানালা বলা হয় কেননা এর মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি চোখে প্রবেশ করে।
৩। কনজাংটিভা	চোখকে বাইরের আঘাত ও জীবাণুর আক্রমণ হতে রক্ষা করে। চোখ পরিষ্কার ও ভেজা রাখে।
৪। কোরয়েড	এর রক্তজালক থেকে স্ক্লেরা ও রেটিনা পুষ্টি গ্রহণ করে। চোখে প্রবেশকৃত অতিরিক্ত আলোক শোষণ করে।
৫। আইরিশ	চোখে আলোক প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।
৬। পিউপিল	পিউপিলের মধ্যদিয়ে চোখে আলোক প্রবেশ করে।
৭। সিলিয়ারি বডি	চোখের লেন্সকে সঠিক স্থানে ঝুলিয়ে রাখে।
৮। লেন্স	আলোকরশ্মি প্রতিসরণ করে রেটিনার উপর কেন্দ্রীভূত করে।
৯। রেটিনা	রেটিনাতে বস্তুর সঠিক দর্শন ও অবস্থা পরিবর্তন অনুধাবন সম্পন্ন হয়।
১০। রডকোষ	স্বল্প আলোতে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।
১১। কোনকোষ	তীব্র আলোতে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।
১২। অন্ধবিন্দু	এস্থানে অপটিক স্নায়ু সংযুক্ত হয়।
১৩। পীত বিন্দু	মানব চোখের পীত বিন্দুতে সবচেয়ে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।
১৪। ভিট্রিয়াস হিউমার	রেটিনা ও লেন্সে পুষ্টি যোগায় এবং অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখে।
১৫। অ্যাকুয়াস হিউমার	রেটিনা ও লেন্সে পুষ্টি যোগায় এবং আলোকরশ্মি প্রতিসরণ করে।
১৬। ল্যাক্রাইমাল গ্রন্থি	এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত অশ্রুচোখকে সিক্ত, পরিচ্ছন্ন ও জীবাণু মুক্ত রাখে।
১৭। মেবোমিয়ান গ্রন্থি	এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তৈলাক্ত পদার্থ চক্ষু পল্লব ও কর্নিয়াকে পিচ্ছিল রাখে।
১৮। হার্ডেরিয়ান গ্রন্থি	এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তৈলাক্ত পদার্থ চক্ষু পল্লব ও কর্নিয়াকে পিচ্ছিল রাখে।
১৯। চক্ষু পল্লব	চোখকে খোলা রাখে বা বন্ধ করে। চোখকে ধুলোবালি, তীব্র আলো, পানি, বাতাস ও আঘাত হতে রক্ষা করে।
২০। চক্ষুপেশি	চক্ষু গোলককে চক্ষুকোটরের ভেতরে ঘুরতে সহায়তা করে।

CS CamScanner

কান: শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ
(Ear: Hearing and Equilibrium organ)

কান মানুষের শ্রবণ ইন্দ্রিয় এবং ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ। মাথার দুপাশে চোখের পেছনে দুটি কান অবস্থিত। প্রতিটি কান করোটির অডিটরি ক্যাপসুলে (auditory capsule) অবস্থিত। মানুষের কানের তিনটি প্রধান অংশ থাকে, যথা–

১। বহিঃকর্ণ (External ear),
২। মধ্যকর্ণ (Middle ear) ও
৩। অন্তঃকর্ণ (Internal ear)।

নিম্নে কানের বিভিন্ন অংশের বিবরণ দেয়া হলো-

১। বহিঃকর্ণ (External ear): এটি কানের সর্ব বাইরের অংশ এবং কর্ণছত্র, কর্ণকুহর ও কর্ণপটহ নিয়ে গঠিত। মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীতে কেবল বহিঃকর্ণই দৃষ্টিগোচর হয় এবং ফলশ্রুতিতে অনেকে কান বলতে কেবল বহিঃকর্ণের কর্ণছত্রকে বুঝে থাকে।

(ক) কর্ণছত্র (Pinna): মাথার দুপাশে বিদ্যমান বহিঃকর্ণের দৃশ্যমান চ্যাপ্টা ও নমনীয় অংশই হলো **কর্ণছত্র** বা পিনা বা অরিকল। এটি ত্বক, পেশি ও তরুণাস্থি নির্মিত। এ গড় দৈর্ঘ্য 5.9-6.4 সেন্টিমিটার এবং গড় প্রস্থ 2.9-3 সেন্টিমিটার।

কাজ: পরিবেশ হতে শব্দ তরঙ্গ সংগ্রহ ও কেন্দ্রীভূত করে কর্ণকূহরে প্রেরণ করা।

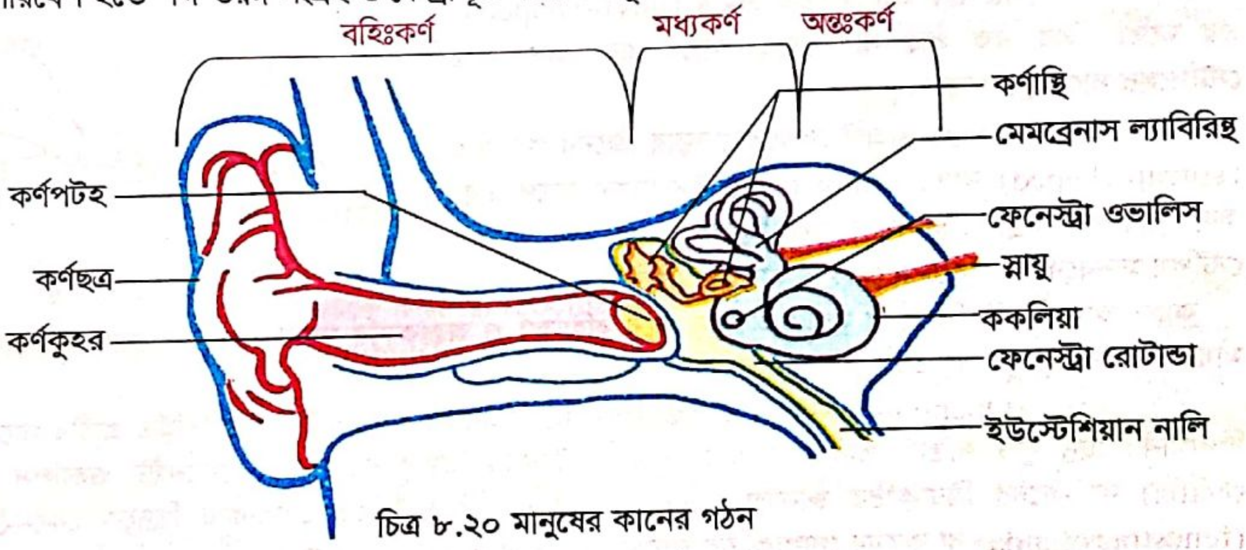

চিত্র ৮.২০ মানুষের কানের গঠন

(খ) কর্ণকুহর (Auditory meatus): কর্ণছত্রের কেন্দ্রে বিদ্যমান ছিদ্র থেকে যে সরু নালি কানের **কর্ণপটহ** পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাকে **কর্ণকুহর** বলে। এটি দৈর্ঘ্যে 2.5 সেন্টিমিটার এবং ব্যাসে 0.7 সেন্টিমিটার। এর অন্তর্ভাগ ত্বকাবৃত এবং ত্বকে লোম ও মোম গ্রন্থি বিদ্যমান।

কাজ: কর্ণকুহরের মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ লম্বভাবে কর্ণপটহে পৌছে। এতে বিদ্যমান মোম ও লোম কানের ভেতরে ধুলোবালি, পতঙ্গ, জীবাণু ইত্যাদি প্রবেশে বাধা দেয়। এটি কর্ণপটহের অনুকূল উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বজায় রাখে।

(গ) কর্ণপটহ (Tympanic membrane): কর্ণকুহরের শেষ প্রান্তে এবং মধ্যকর্ণের সম্মুখে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত পাতলা ও গোলাকার পর্দাকে **কর্ণপটহ** বা কানের পর্দা (eardrum) বলে। এটি প্রায় 0.1 মিলিমিটার পুরু, 9 মিলিমিটার ব্যাস এবং 14 মিলিগ্রাম ওজন বিশিষ্ট মজবুত ও নমনীয় পর্দা যার বাইরের দিক অবতল এবং ভেতরের দিক উত্তল। এ পর্দা ক্ষতিগ্রস্থ হলে সহজে পুনগঠিত হয় না।

কাজ: এটি মধ্যকর্ণের মুখে আড়াআড়িভাবে অবস্থান করে বহিঃকর্ণকে মধ্যকর্ণ হতে পৃথক রাখে। এটি শব্দ তরঙ্গ দ্বারা স্পন্দিত হয় এবং এ স্পন্দনকে বৃদ্ধি করে মধ্যকর্ণে প্রেরণ করে।

২। মধ্যকর্ণ (Middle ear): এটি কানের মধ্যবর্তী অংশ। এটি একটি অসম আকৃতির পার্শ্বীয়ভাবে চাপা বায়ুপূর্ণ প্রকোষ্ঠ বিশেষ। করোটির টিমপ্যানিক অস্থির (temporal bone) ভেতরে মধ্যকর্ণ অবস্থিত। মধ্যকর্ণ নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত:

(ক) ইউস্টেশিয়ান নালি (Eustachian tube): এটি মধ্যকর্ণের গহ্বরের অঙ্কীয়দেশ থেকে সৃষ্ট নাসাগলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নালি। যোড়শ শতাব্দীর ইতালিয়ান শৈল্যবিদ বার্টোলোমো ইউস্টেশি (Bartolommo Eustachio) এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে।

কাজ: এটি মধ্যকর্ণকে নাসাগলবিলের সাথে যুক্ত করে। এটি মধ্যকর্ণকে বায়ু প্রদান করে এবং মধ্যকর্ণে বিদ্যমান মিউকাস পরিষ্কার করে নাসাগলবিলে প্রেরণ করে। এটি কর্ণপটহের উভয় পার্শ্বের বায়ুচাপের সমতা রক্ষা করে।

(খ) কর্ণাস্থি (Ear ossicles): মধ্যকর্ণে তিনটি ক্ষুদ্র অস্থি (ossicle=tiny bone) পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একটি শিকলের মতো অবস্থান করে। এগুলো মানবদেহের সবচেয়ে ছোট অস্থি। অস্থিগুলো হলো–ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস।

(i) ম্যালিয়াস (Malleus)-এটি দেখতে হাতুরির মতো (hammer-shaped)। এর এক প্রান্ত কর্ণপটহের সাথে এবং অন্য প্রান্ত ইনকাসের সাথে যুক্ত।

(ii) ইনকাস (Incus)-এটি দেখতে নেহাই (anvil-shaped)-এর মতো। এর এক প্রান্ত ম্যালিয়াসের সাথে এবং অন্য প্রান্ত স্টেপিসের সাথে যুক্ত থাকে।

(iii) স্টেপিস (Stapes)-এটি দেখতে ঘোড়ার জিনের পাদানির (stirrup-shaped) মতো। এর এক প্রান্ত ইনকাসের সাথে এবং অন্য প্রান্ত ফেনেস্ট্রা ওভালিস নামক ছিদ্রের সাথে যুক্ত থাকে। স্টেপিস মানবদেহের সবচেয়ে ছোট ও হালকা অস্থি।

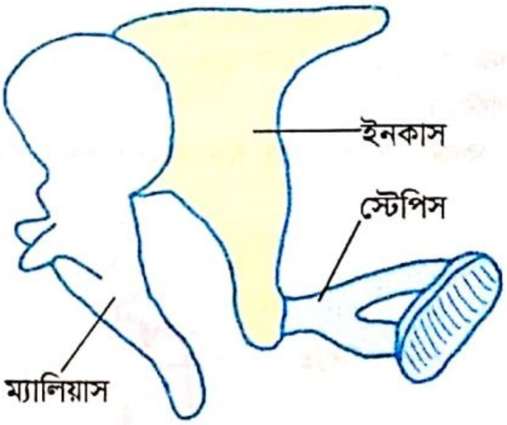

চিত্র ৮.২১ কর্ণাস্থি

কাজ: অস্থি তিনটি শিকলের মতো অবস্থান করে বহিঃকর্ণ ও অন্তঃকর্ণের মাঝে একটি সংযোগ সৃষ্টি করে। এদের মাধ্যমে কর্ণপটহে সৃষ্ট শব্দতরঙ্গ পরিবাহিত হয়ে অন্তঃকর্ণে পৌছায়।

(গ) ছিদ্রপথ (Openings): মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণের মধ্যে অবস্থিত পেরিওটিক অস্থি নির্মিত প্রাচীর গাত্রে দুটি ছিদ্র বিদ্যমান। ছিদ্র দুটি পাতলা পর্দা দ্বারা ঢাকা থাকে। উপরের ডিম্বাকৃতির ছিদ্রকে ফেনেস্ট্রা ওভালিস (fenestra ovalis) বা কানের ডিম্বাকৃতির জানালা (oval window) এবং নিচের গোলাকার ছিদ্রকে ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা (fenestra rotunda) বা কানের গোলাকৃতির জানালা (round window) বলে।

কাজ: ফেনেস্ট্রা ওভালিস দিয়ে শব্দ তরঙ্গ মধ্যকর্ণ থেকে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে। অন্তঃকর্ণের ককলিয়ায় শ্রবণ অনুভূতি সৃষ্টির পর অতিরিক্ত শব্দ তরঙ্গ ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা দিয়ে অন্তঃকর্ণ থেকে মধ্যকর্ণে ফিরে এসে প্রশমিত হয়।

৩। অন্তঃকর্ণ (Internal ear): করোটির অডিটরি ক্যাপসুলের (auditory capsule) পেরিওটিক অস্থির অভ্যন্তরে অন্তঃকর্ণ অবস্থান করে। অন্তঃকর্ণের প্রধান অংশ হলো পাতলা পর্দা জাতীয় মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ (membranous labyrinth) নামক একটি জটিল অঙ্গ। এ অঙ্গটি এন্ডোলিম্ফ (endolymph) নামক তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে। পেরিলিম্ফ (perilymph) নামক তরল পদার্থপূর্ণ অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ (bony labyrinth) দ্বারা মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ পরিবেষ্টিত থাকে। এন্ডোলিম্ফ ও পেরিলিম্ফ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে।

মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ এর মূলদেহ ইউট্রিকুলাস (utriculus) এবং স্যাকুলাস (sacculus) নামক দুটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। ইউট্রিকুলাস আকারে বড় এবং উপরে অবস্থান করে। স্যাকুলাস ছোট এবং ইউট্রিকুলাসের নিচে অবস্থান করে। স্যাকুলোইউট্রিকুলার নামক একটি সরু ও সংক্ষিপ্ত নালি দ্বারা দুটি প্রকোষ্ঠ পরস্পর সংযুক্ত থাকে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে ম্যাকুলা (macula) নামের কতগুলো সংবেদী কোষ থাকে এবং এগুলো থেকে সংবেদী লোম বের

হয়। লোমগুলো কানের পাথর বা অটোলিথ (otolith) সমন্বিত জেলিতে ডুবে থাকে। এসব সংবেদী কোষ ও লোম মানুষের মাথার অবস্থান ঠিক রাখে।

(ক) ইউট্রিকুলাস (Utriculus): ইউট্রিকুলাস বা ভেস্টিবিউলার অ্যাপারেটাস (vestibular apperatus) কানের ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ। এটি একটি ভেস্টিবিউল বা গোলাকার প্রকোষ্ঠ এবং তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালি (semicircular canal) নিয়ে গঠিত। নালিগুলোর মধ্যে দুটি উল্লম্বিক এবং একটি অনুভূমিকভাবে অবস্থান করে। নালিগুলো পরস্পর সমকোণে অবস্থান করে। প্রতিটি নালির এক প্রান্ত কিছুটা স্ফীত হয়ে অ্যাম্পুলা (ampulla) গঠন করে। অ্যাম্পুলার অভ্যন্তরে ক্রিস্টি (cristae) নামের সংবেদী লোমবাহী কতগুলো কোষ থাকে। সংবেদী লোমগুলো চুনময় জেলির মতো অটোলিথ (otolith) দ্বারা আবৃত থাকে।

কাজ: ইউট্রিকুলাস দেহের ভারসাম্য রক্ষায় প্রধান ভূমিকা রাখে।

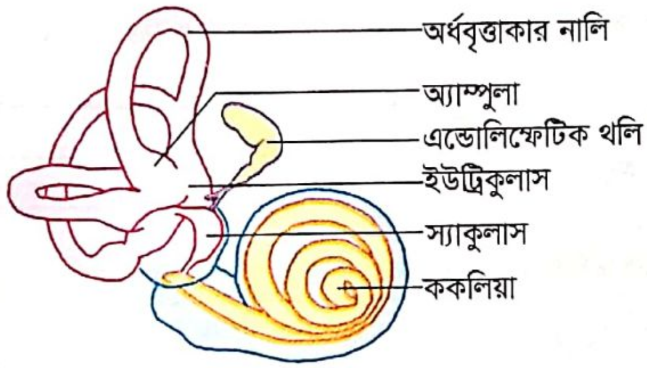

চিত্র ৮.২২ মানুষের অন্তঃকর্ণ

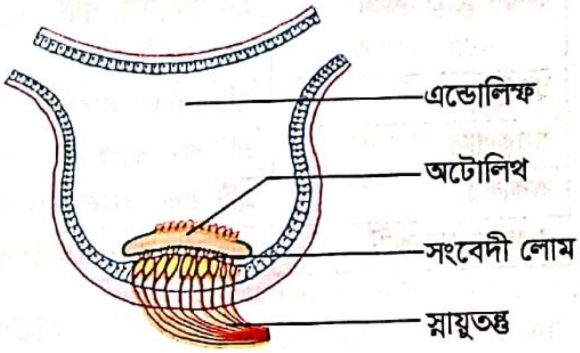

চিত্র ৮.২৩ ইউট্রিকুলাসের প্রস্থচ্ছেদ

(খ) স্যাকুলাস (Sacculus): এটি কানের শব্দ অনুভূতি সৃষ্টিকারী অংশ। এটি একটি নলাকার প্রকোষ্ঠ এবং ইউট্রিকুলাসের নিচের দিকে অবস্থিত। স্যাকুলাসের অঙ্কীয় দিক হতে শামুকের খোলকের মতো প্যাঁচানো 35 মিলিমিটার লম্বা একটি নালির সৃষ্টি হয়। একে ককলিয়া (cochlea) বলে। ককলিয়া তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উপরের প্রকোষ্ঠকে স্কেলা ভেস্টিব্যুলি (scala vestibuli), মাঝের প্রকোষ্ঠকে স্কেলা মিডিয়া (scala media) এবং নিচের প্রকোষ্ঠকে স্কেলা টিম্পানি (scala tympani) বলে। মাঝের প্রকোষ্ঠ স্কেলা মিডিয়া উপরে রেসনার পর্দা (Reissner's membrane) ও নিচে বেসিলার পর্দা (basilar membrane) দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং এতে শ্রবণ অঙ্গ অরগান অব কর্টি (organ of corti) বিদ্যমান থাকে। ইতালিয়ান শৈল্যবিদ গ্যাসপেরি কর্টি (Gaspare Corti, 1822–1876) এর নামানুসারে এ অঙ্গটির নামকরণ করা হয়েছে।

অরগান অব কর্টি বেসিলার মেমব্রেন, সংবেদী লোমকোষ, সমর্থনকারী কোষ, হেনসেন কোষ, ক্লডিয়াস কোষ, টেকটোরিয়াল পর্দা ইত্যাদি দ্বারা গঠিত। এতে লোমকোষের সংখ্যা প্রায় 5 হাজার। এর প্রতিটি লোমকোষের সাথে অডিটরি স্নায়ুর নিউরন যুক্ত থাকে এবং প্রতিটি লোমকোষ থেকে একাধিক লোম সৃষ্টি হয়ে ককলিয়ার নালির এন্ডোলিম্ফে (endolymph) বিস্তৃত থাকে। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন শব্দতরঙ্গের প্রভাবে অরগান অব কর্টি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

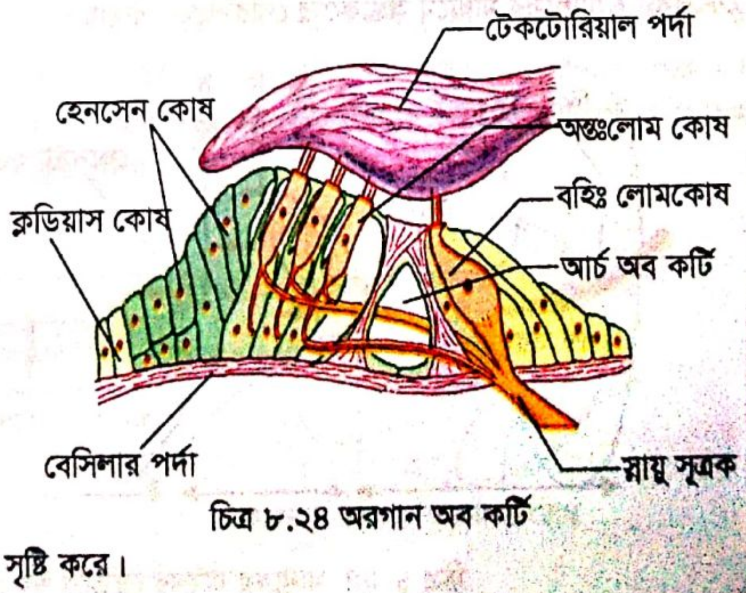

চিত্র ৮.২৪ অরগান অব কর্টি

কাজ: স্যাকুলাস শব্দ তরঙ্গ থেকে শ্রবণ অনুভূতি সৃষ্টি করে।

CamScanner

এক নজরে কানের বিভিন্ন অংশের প্রধান কাজ

কানের অংশ	প্রধান কাজ
কর্ণছত্র	পরিবেশ হতে শব্দ তরঙ্গ সংগ্রহ ও কেন্দ্রীভূত করে কর্ণকুহরে প্রেরণ করা।
কর্ণকুহর	এর মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ লম্বভাবে কর্ণপটহে পৌছে। এটি কর্ণপটহের অনুকূল উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বজায় রাখে।
কর্ণপটহ	বহিঃকর্ণকে মধ্যকর্ণ হতে পৃথক রাখে এবং শব্দ তরঙ্গকে মধ্যকর্ণে প্রেরণ করে।
ইউস্টেশিয়ান নালি	কর্ণপটহের উভয় পার্শ্বের বায়ুচাপের সমতা রক্ষা করে।
কর্ণাস্থি	এদের মাধ্যমে কর্ণপটহে সৃষ্ট শব্দতরঙ্গ 20 গুণ বৃদ্ধি পেয়ে অন্তঃকর্ণে পৌছায়।
ফেনেস্ট্রা ওভালিস	এর মধ্যদিয়ে শব্দ তরঙ্গ মধ্যকর্ণ থেকে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে।
ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা	এর মধ্যদিয়ে শ্রবণ অনুভূতি সৃষ্টির পর অতিরিক্ত শব্দ তরঙ্গ অন্তঃকর্ণ থেকে মধ্যকর্ণে ফিরে এসে প্রশমিত হয়।
ইউট্রিকুলাস	এটি দেহের ভারসাম্য রক্ষায় প্রধান ভূমিকা রাখে।
স্যাকুলাস	এটি শব্দ তরঙ্গ থেকে শ্রবণ অনুভূতি সৃষ্টি করে।
ককলিয়া	এটি শ্রবণ অনুভূতি গ্রহণ করে এবং মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।
অরগান অব কর্টি	এটি শব্দ কম্পনকে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনায় পরিণত করে।

শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় কানের ভূমিকা
(Role of Ear in Hearing and maintaining Balance)

মানুষের কান একসাথে দুটি ভিন্নধর্মী কাজ সম্পাদন করে। এদের একটি শ্রবণ ও অন্যটি দেহের ভারসাম্য রক্ষা। এ দুটি কাজের একটির সাথে অন্যটির কোনো সম্পর্ক নেই।

শ্রবণ কৌশল (Mechanism of Hearing): মানুষের শ্রবণ প্রক্রিয়া নিম্নে বর্ণিত চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়-

ধাপ-১ কানে শব্দ তরঙ্গ প্রবেশ: পরিবেশে সৃষ্ট শব্দতরঙ্গ পিনা বা কর্ণছত্রে সংগৃহীত হয়ে কর্ণকুহরে প্রবেশ করে কর্ণপটহ বা টিমপানিক পর্দাকে আঘাত করে। এতে কর্ণপটহে কম্পণের সৃষ্টি হয়।

ধাপ-২ মধ্যকর্ণে শব্দ তরঙ্গের প্রবাহ: কর্ণপটহ থেকে শব্দতরঙ্গ মধ্যকর্ণে প্রবেশের পর কর্ণাস্থিসমূহ (মেলিয়াস → ইনকাস → স্টেপিস) দ্বারা পরিবাহিত হওয়ার সময় এর কম্পন শক্তি প্রায় 20 গুণ বৃদ্ধি পায়। এরপর শব্দতরঙ্গ ফেনেস্ট্রা ওভালিসের মাধ্যমে অন্তঃকর্ণের পেরিলিম্ফে পৌছায়।

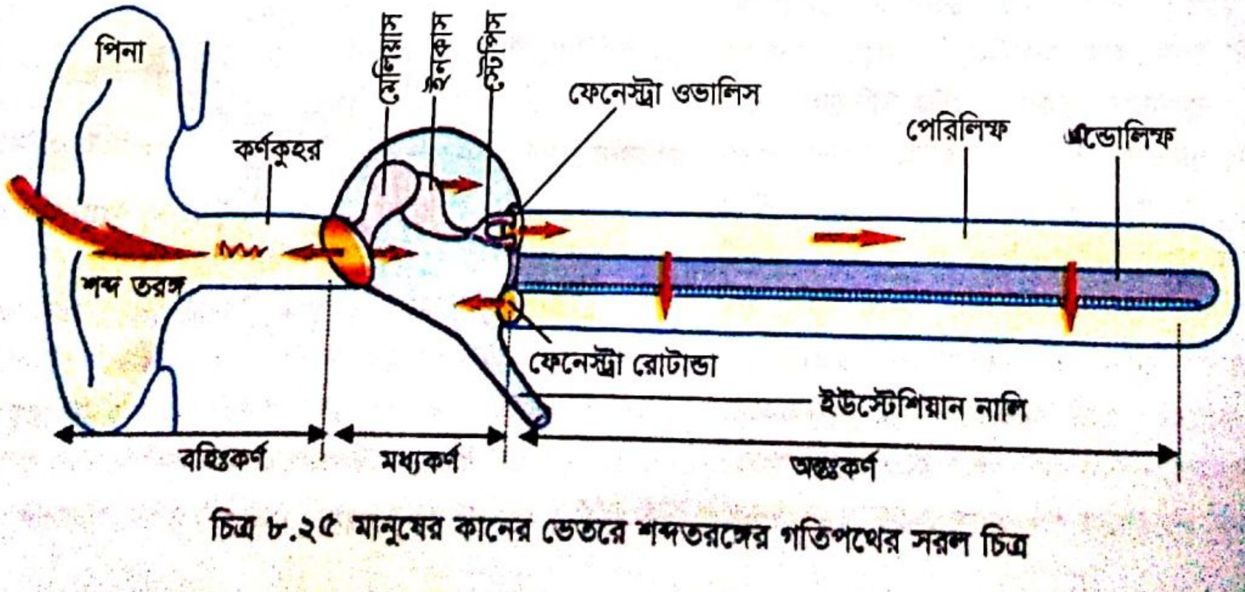

চিত্র ৮.২৫ মানুষের কানের ভেতরে শব্দতরঙ্গের গতিপথের সরল চিত্র

ধাপ-৩ অন্তঃকর্ণে (ককলিয়ায়) শব্দ তরঙ্গের প্রবাহ: শব্দতরঙ্গ অন্তঃকর্ণে প্রবেশের পর উহা পেরিলিম্ফে কম্পন সৃষ্টি করে। এ কম্পনে ককলিয়ায় বিদ্যমান অর্গান অব কর্টির অসংখ্য সংবেদী রোমশ কোষ বা স্টেরিওসেলা (stereocilia) উদ্দীপিত হয়ে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা (electrical impulse) সৃষ্টি করে। শব্দের এ বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্রে প্রেরিত হয়। অতিরিক্ত শব্দতরঙ্গ ফেনেস্ট্রা রোটান্ডার মাধ্যমে মধ্যকর্ণে ফিরে আসে এবং প্রশমিত হয়ে যায়। মানুষের জন্মের সময় দুই কানে প্রায় 10000 স্টেরিওসেলা থাকে। উচ্চ তরঙ্গের শব্দ, রোগ এবং বিষক্রিয়া দ্বারা এসব কোষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কিন্তু পুনঃজন্ম নেয় না। এর ফলে মানুষের শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়, এমনকি বধির হয়ে যায় এবং ভারসাম্যহীন হয়ে পরে।

ধাপ-৪ মস্তিষ্কে উদ্দীপণা বিশ্লেষন ও শ্রবণ: মস্তিষ্কের অডিটরি কমপ্লেক্স বা শ্রবণ কেন্দ্রে বিদ্যমান সেনসরি নিউরনের মাধ্যমে শব্দের বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা বিশ্লেষিত হয় এবং মানুষ শুনতে পায়।

নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে মানুষের শ্রবণ কৌশল দেখানো হলো-

কর্ণছত্র দ্বারা শব্দতরঙ্গ গ্রহণ → কর্ণপটহের কম্পণ → কর্ণাস্থি দ্বারা কম্পন শক্তির বৃদ্ধি → শব্দতরঙ্গ ফেনেস্ট্রা ওভালিসের মাধ্যমে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ → শব্দতরঙ্গ দ্বারা পেরিলিম্ফে কম্পন সৃষ্টি → অর্গান অব কর্টির সংবেদী রোমশ কোষের উদ্দীপিত হওয়া → স্নায়ু উদ্দীপনা অডিটরি স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে প্রেরণ → শ্রবণ সম্পন্ন

ভারসাম্য রক্ষা কৌশল (Mechanism of maintaining Balance)

মস্তিষ্ক, চোখ, অন্তঃকর্ণ এবং পেশি ও সন্ধিসমূহ মানবদেহের ভারসাম্য রক্ষায় অংশগ্রহণ করে। প্রান্তীয় অঙ্গ চোখ, অন্তঃকর্ণ এবং পেশি ও সন্ধিসমূহ থেকে প্রেরিত স্নায়ু উদ্দীপনা কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের মতো মস্তিষ্ক দ্বারা গৃহীত হয়। যদিও এসব অঙ্গাদির নিজস্ব কাজে স্বাধীন তবুও দেহের ভারসাম্য রক্ষায় তার একত্রে কাজ করে।

চোখ আলোক সংবেদ গ্রহিতা হিসেবে দেহের পারিপার্শ্বিক অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। পেশি ও সন্ধিতে বিদ্যমান সংবেদ গ্রাহকগুলোকে প্রোপ্রিয়োসেপ্টর (proprioceptors) বলে। এগুলো মানুষের মাথা, গ্রীবা ও পায়ের গোড়ালির পেশি ও সন্ধিতে অধিক পরিমাণে থাকে।

মানুষের অন্তঃকর্ণের প্রধান দুটি অংশ ইউট্রিকুলাসের ভেস্টিবিউল এবং তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালির অ্যাম্পুলার ক্রিস্টির সংবেদী কোষসমূহ ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ। এদেরকে একত্রে ভেস্টিবিউলার ল্যাবিরিন্থ (vestibular labyrinth) বলে। ফরাসি স্নায়ুবিদ মেরি জ্যাঁ পাইরে ফ্লোরেন্স (Marie-Jean-Pierre Flourens,1824) এটি আবিষ্কার করেন। এসব কোষ থেকে যে সংবেদী লোম বের হয় সেগুলো এন্ডোলিম্ফে ডুবে থাকে। সংবেদী লোমগুলো $CaCO_3$ সমৃদ্ধ জেলির মতো অটোলিথ (otolith) দ্বারা আবৃত থাকে। অ্যাম্পুলার এ অংশকে ক্যুপুলা (cupula) বলে। মানুষের মাথা কোনো এক তলে হেলে গেলে ঐ পাশে বেশি অটোলিথ প্রবাহিত হয় এবং সংবেদী লোমের সংস্পর্শে আসে, ফলে সংবেদী কোষগুলো উদ্দীপিত হয়। এ উদ্দীপনা ভেস্টিবিউলার স্নায়ুর (vestibular nerve) মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছালে মানুষ তার আপেক্ষিক অবস্থান বুঝতে পারে। তখন মস্তিষ্কের নির্দেশে প্রয়োজনীয় পেশির সঙ্কোচনে মাথা আবার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসে এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষা হয়।

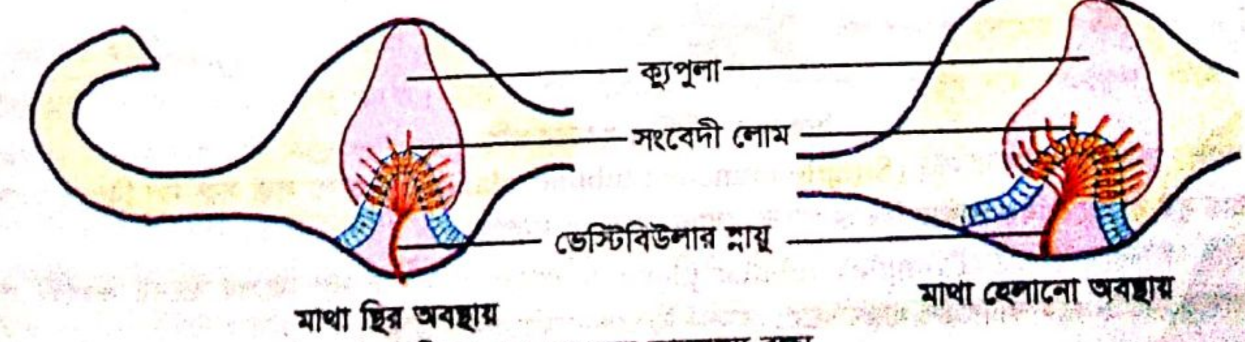

চিত্র ৮.২৬ মানুষের ভারসাম্য রক্ষা

CamScanner

৮.৫ রাসায়নিক সমন্বয় (Chemical coordination)

দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমে সমন্বয় ঘটানোর অন্যতম উপায় হলো রাসায়নিক সমন্বয়। মানবদেহে তিন ধরনের রাসায়নিক সমন্বয় দেখা যায়, যথা -

১। এন্ডোক্রাইন সমন্বয়: এক্ষেত্রে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ক্ষরিত হরমোন রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে কোষে কোষে সমন্বয় সাধন করে। যেমন, পিটুইটারি গ্রন্থি ক্ষরিত Thyroid stimulating hormone রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে থাইরয়েড গ্রন্থিতে পৌছে এবং অধিক হরমোন উৎপাদনের জন্য উহাকে উদ্দীপিত করে।

২। প্যারাক্রাইন সমন্বয়: এক্ষেত্রে স্থানীয় কোনো একটি কোষে উৎপাদিত রাসায়নিক পদার্থ বহিঃকোষীয় তরল দ্বারা পরিবাহিত হয়ে পার্শ্ববর্তী অন্য একটি কোষকে প্রভাবিত করে। যেমন- অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্সের α-কোষ থেকে নিঃসৃত গ্লুকাগণ পার্শ্ববর্তী β-কোষের নিঃসরণকে বাধা দেয়।

৩। অটোক্রাইন সমন্বয়: এক্ষেত্রে একই কোষে উৎপাদিত রাসায়নিক পদার্থ ঐ কোষের কার্যকে প্রভাবিত করে। যেমন- রক্তনালির প্রাচীরের এন্ডোথেলিয়াল কোষে উৎপাদিত Platelet activating factor ঐ কোষেই কাজ করে।

গ্রন্থি (Glands)

গ্রন্থি হলো এক ধরনের রূপান্তরিত আবরণী কলা যার কোষসমূহ বিশেষ ধরনের প্রোটিনধর্মী রস নিঃসরণ বা ক্ষরণ করে। ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের নির্দিষ্ট পর্যায়ে দেহের নির্দিষ্ট অঞ্চলে গ্রন্থি সৃষ্টি হয়। গ্রন্থি হতে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরিত হয় যেগুলো সুনির্দিষ্ট কাজে অংশগ্রহণ করে। সাধারণত গ্রন্থি হতে মিউকাস, এনজাইম ও হরমোন ক্ষরিত হয়।

গ্রন্থির প্রকারভেদ

মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থি বিদ্যমান। এদেরকে নিম্নরূপে শ্রেণিবিন্যস্ত করা হয়-

❑ কোষের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে গ্রন্থি দুপ্রকার, যথা-

১। এককোষী গ্রন্থি (Unicellular glands): একটি কোষ স্বাধীনভাবে রস নিঃসরণ করে। যেমন- এপিডার্মিসের মিউকাস কোষ, ক্ষুদ্রান্ত্রের গবলেট কোষ ইত্যাদি।

২। বহুকোষী গ্রন্থি (Multicellular glands): একাধিক কোষ সম্মিলিতভাবে সরল বা জটিল ধরনের গ্রন্থি গঠন করে। বহুকোষী গ্রন্থি অনেক রকম হয়, যেমন-

ক. সরল প্যাঁচানো নলাকার গ্রন্থি (Simple coiled tubular glands): এগুলো লম্বা সরু নল বিশেষ যাদের দূরবর্তী প্রান্ত কিছুটা প্যাঁচানো ও বদ্ধ থাকে, যেমন- ঘর্মগ্রন্থি।

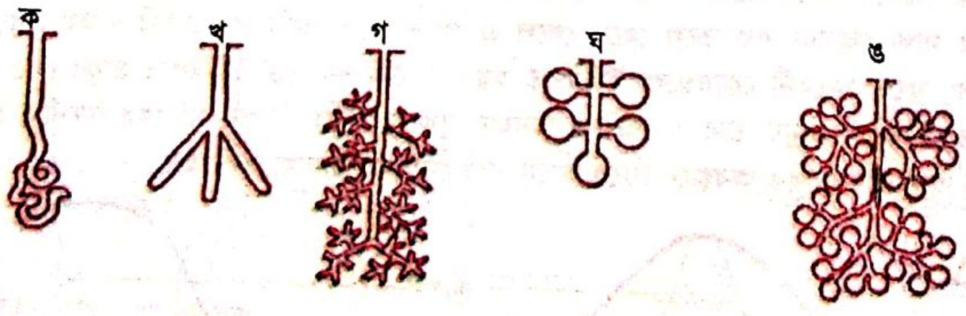

চিত্র ৮.২৭ বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থি

খ. সরল শাখান্বিত নলাকার গ্রন্থি (Simple branched tubular glands): এগুলো লম্বা সরু নল বিশেষ যাদের দূরবর্তী প্রান্ত দুই বা ততোধিক শাখায় বিভক্ত থাকে, যেমন- বগলের ঘর্মগ্রন্থি।

গ. যৌগিক নলাকার গ্রন্থি (Complex tubular glands): এগুলো লম্বা সরু নল বিশেষ যাদের দূরবর্তী প্রান্ত অসংখ্য শাখায় বিভক্ত হয়ে জটিলরূপ ধারণ করে, যেমন- ডিওডেনামের ব্রুনার্স গ্রন্থি।

CamScanner

ঘ. সরল শাখান্বিত অ্যালভিওলার গ্রন্থি (Simple branched alveolar glands): এক্ষেত্রে সরল শাখান্বিত নলের প্রান্তভাগসমূহ স্ফীত হয়ে বাল্ব বা থলি গঠন করে, যেমন-চোখের মিবোমিয়ান গ্রন্থি, ত্বকের সিবেসিয়াস গ্রন্থি।

ঙ. যৌগিক অ্যালভিওলার গ্রন্থি (Compound alveolar glands): এক্ষেত্রে যৌগিক শাখান্বিত নলের প্রান্তভাগসমূহ স্ফীত হয়ে বাল্ব বা থলি গঠন করে, যেমন-স্তনগ্রন্থি।

❑ গ্রন্থি নিঃসৃত রস পরিবাহী নালির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির ভিত্তিতে মানবদেহের গ্রন্থিসমূহকে প্রধান দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

(১) সনাল গ্রন্থি বা বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (Exocrine glands): এসব গ্রন্থির নিঃসৃত রস নির্দিষ্ট নালিপথে পরিবাহিত হয়ে নির্দিষ্ট অঙ্গে পৌছায়। যকৃত, লালাগ্রন্থি এবং অগ্ন্যাশয়ের সনাল অংশ এ প্রকৃতির গ্রন্থি। সনাল গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন এনজাইম ও মিউকাস নিঃসৃত হয়।

(২) অনাল গ্রন্থি বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine glands): এসব গ্রন্থি নালি বিহীন। এদের ক্ষরিত রসকে প্রাণরস বা হরমোন বলে। হরমোন রক্তের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে পৌছায়ে ক্রিয়া করে। পিটুইটারি গ্রন্থি, অ্যাডরেনাল গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি ইত্যাদি অনাল গ্রন্থি।

অনাল গ্রন্থি (Endocrine glands) ও সনাল গ্রন্থির (Exocrine glands) মধ্যে পার্থক্য

অনাল গ্রন্থি বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি	সনাল গ্রন্থি বা বহিঃক্ষরা গ্রন্থি
১। দেহের নালিবিহীন গ্রন্থিসমূহকে অনাল বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলে।	১। দেহের নালিযুক্ত গ্রন্থিসমূহকে সনাল বা বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলে।
২। অনাল গ্রন্থি থেকে প্রাণরস বা হরমোন ক্ষরিত হয়।	২। সনাল গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন এনজাইম ও মিউকাস নিঃসৃত হয়।
৩। হরমোন রক্ত ও লসিকা দ্বারা বাহিত হয়।	৩। এনজাইম ও মিউকাস নালি দ্বারা বাহিত হয়।
৪। এসব গ্রন্থি থেকে স্বল্প মাত্রায় হরমোন ক্ষরিত হয়ে দেহের দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।	৪। এসব গ্রন্থি থেকে অধিক মাত্রায় নিঃসৃত এনজাইম ও মিউকাসের কার্যকারিতা ক্ষণস্থায়ী ও তাৎক্ষণিক।
৫। উদাহরণ - পিটুইটারি গ্রন্থি, অ্যাডরেনাল গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি ইত্যাদি।	৫। উদাহরণ- লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয়ের সনাল অংশ ইত্যাদি।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine glands)

মানবদেহের অধিকাংশ রাসায়নিক সমন্বয় ঘটে হরমোনের মাধ্যমে। দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নালিবিহীন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন ধরনের হরমোন ক্ষরিত হয়। যেসব নালিহীন গ্রন্থি ক্ষরিত রাসায়নিক বার্তাবাহক বা হরমোন রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে দূরবর্তী স্থানে ক্রিয়া করে তাদের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলে। মানবদেহের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে প্রায় 30 ধরনের হরমোন ক্ষরিত হয় যারা সুনির্দিষ্ট কাজে অংশগ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে দেহের সকল ধরনের জৈবিক কার্যাবলিতে হরমোনের হস্তক্ষেপ থাকে। মানবদেহে বিদ্যমান বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির নাম, অবস্থান, গঠন, ক্ষরিত হরমোনের নাম ও কার্যাবলি নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হলো-

I. হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus)

মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। এ গ্রন্থি থেকে যেসব হরমোন ক্ষরিত হয় সেগুলো মূলত পিটুইটারি গ্রন্থির ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এসব হরমোনকে পূর্বে রিলিজিং ফ্যাক্টর (releasing factors) বলা হতো। হাইপোথ্যালামাস ক্ষরিত হরমোনসমূহ হলো-

CamScanner

হরমোন	যা নিয়ন্ত্রণ করে-
১। গ্রোথ হরমোন রিলিজিং হরমোন (GHRH)	গ্রোথ হরমোন (GH) ক্ষরণ
২। থাইরেট্রোফিন রিলিজিং হরমোন (TRH)	থাইরায়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (TSH) ক্ষরণ এবং প্রোল্যাকটিন (PRL) ক্ষরণ
৩। কর্টিকোট্রফিন রিলিজিং হরমোন (CRH),	অ্যাড্রিনোকরটিকোট্রফিক হরমোন (ACTH) ক্ষরণ
৪। গোনাডোট্রফিন রিলিজিং হরমোন (GRH)	লুটিনাইজিং হরমোন (LH) এবং ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) ক্ষরণ
৫। সোমাটোস্ট্যাটিন (SS)	গ্রোথ হরমোন ক্ষরণ রোধ
৬। ডোপামিন (DA)	প্রোল্যাকটিন ক্ষরণ রোধ

II. পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)

এটি মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের সাথে একটি বোঁটা দ্বারা সংযুক্ত মটরদানার মতো গোলাকার এবং 0.5 গ্রাম ওজন বিশিষ্ট গ্রন্থি। একে **হাইপোফাইসিস** (hypophysis) নামেও অভিহিত করা হয়। এটি অগ্রপিটুইটারি খণ্ড বা adenohypophysis এবং পশ্চাৎপিটুইটারি খণ্ড বা neurohypophysis নামক দুই অংশে বিভক্ত। এ গ্রন্থি থেকে সর্বাধিক সংখ্যক হরমোন ক্ষরিত হয় এবং এসব হরমোন অন্যান্য প্রায় সকল গ্রন্থির উপর প্রভাব বিস্তার করে কিংবা কাজের সমন্বয় ঘটায়। এজন্য এ গ্রন্থিকে **গ্রন্থির রাজা** বা **প্রভু গ্রন্থি** (master gland or Master of endocrine orchestra) বলে। পিটুইটারি গ্রন্থি ক্ষরিত হরমোনসমূহের নাম ও কাজ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্র. নং	হরমোনের নাম	কাজ
		অগ্র পিটুইটারি
১।	মানব গ্রোথ হরমোন বা সোমাটোট্রফিক হরমোন (HGH or STH)	১। এটি কলা, অস্থি, পেশি ও অন্তঃঅঙ্গের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। ২। এটি বিভিন্ন খাদ্য বিপাক ত্বরান্বিত ও প্রোটিন সংশ্লেষণ করে। ৩। এটি হৃৎপেশি ও অস্থি হতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ভাঙ্গে।
২।	থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (TSH)	১। থাইরয়েড গ্রন্থিকে হরমোন সংশ্লেষ ও ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। ২। থাইরয়েড কলার আয়োডিন গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করে।
৩।	অ্যাডরিনো কর্টিকোট্রফিক হরমোন (ACTH)	১। অ্যাডরেনাল গ্রন্থির স্টেরয়েড হরমোন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ২। মেলানোসাইট উৎপাদনকে প্রভাবিত করে।
৪।	লুটিনাইজিং হরমোন (LH)	১। শুক্রাশয়ের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষসমূহকে উদ্দীপিত করে এন্ড্রোজেন বা টেস্টোস্টেরন হরমোনের ক্ষরণ ঘটায়। ২। ডিম্বাশয়ের কর্পাস লুটিয়াম সৃষ্টি ও প্রোজেস্টেরন হরমোন ক্ষরণ ঘটায়।
৫।	ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH)	১। শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালিকাকে উদ্দীপিত করে শুক্রাণুজনন ঘটায়। ২। ওভারিয়ান ফলিকলের বৃদ্ধি, ওভুলেশন ও ইস্ট্রোজেন সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।
৬।	লুটিওট্রফিক হরমোন (LTH)	১। স্ত্রীদের স্তনগ্রন্থির বিকাশ ও দুগ্ধ ক্ষরণ ঘটায়। ২। পুরুষ ও স্ত্রীদের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।
৭।	মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন (MSH)	১। এটি মেলানোসাইটের পিগমেন্ট সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে ত্বকের বর্ণ নির্ধারণ করে।

CamScanner

	পশ্চাৎ পিটুইটারি	
৮।	অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন বা ভেসোপ্রেসিন (ADH /Vassopressin)	১। এটি রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। ২। এটি বৃক্কের পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং অতি মূত্রত্যাগ রোধ করে। ৩। পাকস্থলি ও অন্ত্রের সঞ্চালন বৃদ্ধি করে।
৯।	অক্সিটোসিন (Oxytocin)	১। এটি স্তনের পেশি সঙ্কোচন ঘটিয়ে দুগ্ধ ক্ষরণে সাহায্য করে। ২। এটি প্রসবের সময় জরায়ুর সঙ্কোচন ত্বরান্বিত করে।

III. থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland)

গ্রীবার সম্মুখে স্বরযন্ত্রের নিচে ট্রাকিয়া সংলগ্ন থাইরয়েড গ্রন্থি অবস্থিত। প্রজাপতি সদৃশ্য বা ইংরেজি H আকৃতির থাইরয়েড গ্রন্থি দুটি খণ্ড নিয়ে গঠিত যারা ইথমাস (isthmus) নামক সংযোজক দ্বারা যুক্ত থাকে। পরিণত মানুষের থাইরয়েড গ্রন্থির ওজন 25 গ্রাম, এর প্রতিটি খণ্ড $5\times3\times2$ সেন্টিমিটার আকার বিশিষ্ট। বিভিন্ন আকৃতির থাইরয়েড ফলিকল (follicles) দ্বারা গ্রন্থিটি গঠিত এবং যোজক কলা ও রক্তনালি দ্বারা উক্ত ফলিকলগুলো পরস্পর থেকে পৃথক থাকে। থাইরয়েড গ্রন্থি ক্ষরিত হরমোন ও এদের কাজ হলো-

১। থাইরক্সিন (Thyroxine/T4): (i) আয়োডিন, প্রোটিন ও শর্করা বিপাক হার বৃদ্ধি করে, (ii) মস্তিষ্ক ও যৌনাঙ্গের বিকাশ ঘটায়, (iii) হৃৎক্রিয়া বৃদ্ধি করে, (iv) দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

২। ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন (Tri-iodothyronine/T3):

(i) এটি আয়োডিন বিপাক, প্রোটিন সংশ্লেষ ও লাইপোলাইসিস হার বৃদ্ধি করে, (ii) এটি ভ্রূণীয় বিকাশে ভূমিকা রাখে, (iii) এটি স্নায়ুতন্ত্রের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

৩। থাইরোক্যালসিটোনিন (Thyrocalcitonin/CT)

(i) এটি অস্থির ক্যালসিয়াম শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, (ii) এটি ফসফেট বিপাক ও পরিবহন উদ্দীপিত করে, (iii) এটি দেহের ভিটামিন D নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

IV. প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland)

থাইরয়েড গ্রন্থির প্রতি খণ্ডের সম্মুখ-পার্শ্বীয়ভাবে একটি করে মোট একজোড়া ক্ষুদ্র, ডিম্বাকৃতির প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি বিদ্যমান। ধানের দানার মতো এ গ্রন্থির ওজন 30 মিলিগ্রাম এবং ব্যাস 3-4 মিলিমিটার। এ গ্রন্থি থেকে প্যারাথরমোন (Parathormone) হরমোন ক্ষরিত হয়।

কাজ: (i) এটি অস্থির ফসফেট ও ক্যালসিয়ামের শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, (ii) এটি ফসফেটের রেচন হার বৃদ্ধি করে, (iii) এটি বৃক্কের ক্যালসিয়াম ধরে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

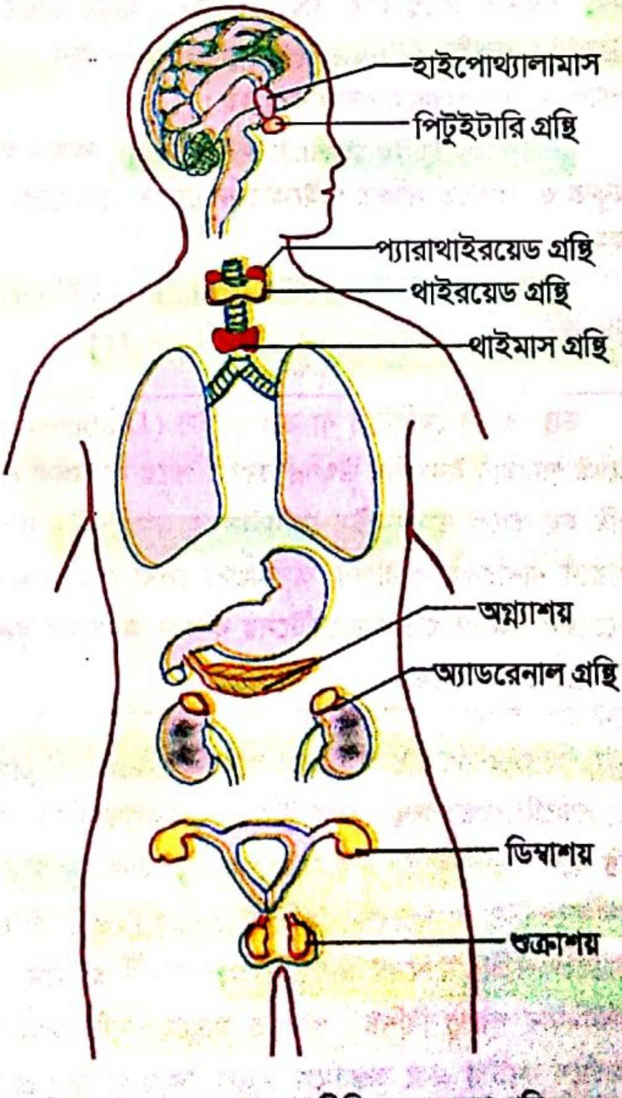

চিত্র ৮.২৮ মানবদেহের বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি

V. থাইমাস গ্রন্থি (Thymus gland)

শ্বাসনালির দুপাশে দুটি থাইমাস গ্রন্থি থাকে। এটি অনাক্রম্যতন্ত্রের অংশ গঠন করে। শৈশবে এগুলো বড় থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের কিয়দংশ ঢেকে রাখে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে ক্ষুদ্রাকার ধারণ করে। এগুলো অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি কি না এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ গ্রন্থি থেকে থাইমোসিন (Thymosin) হরমোন ক্ষরিত হয়।

কাজ: (i) এটি লিম্ফোসাইট ও অ্যান্টিবডি গঠনে সহায়তা করে। (ii) এটি অস্থিতে খনিজলবণ জমতে সহায়তা করে।

VI. আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (Islets of Langerhans)

অগ্ন্যাশয়ের কতগুলো কোষ গুচ্ছাকারে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মতো কাজ করে। আবিষ্কারক পল ল্যাঙ্গারহ্যান্স (1847–1888)-এর নামানুসারে এসব কোষগুচ্ছকে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স বলে। আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স অগ্ন্যাশয়ের মাত্র 1-2% গঠন করে এবং আলফা (α), বিটা (β) ও ডেল্টা (δ) নামক তিন ধরনের কোষ দ্বারা এগুলো গঠিত। এসব কোষগুচ্ছ থেকে ক্ষরিত হরমোন হলো-

❑ ইনসুলিন (Insulin): বিটা (β) কোষ (আইলেটস কোষের 65–80%) থেকে ক্ষরিত এ হরমোন- (i) কোষে শর্করা বিপাক হার বৃদ্ধি করে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হ্রাস করে, (ii) যকৃত ও পেশির গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করে। ইনসুলিন হরমোন মানবদেহে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ইনসুলিন-এর অভাবে ডায়াবেটিস রোগ হয়। বর্তমান বিশ্বে প্রায় 387 মিলিয়ন মানুষ ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত। ইনসুলিন হরমোন আবিষ্কারের জন্য ফ্রেডরিক বানটিং (Frederick Banting) ও জন ম্যাকলিয়ড (John Macleod) নামক দুজন বিজ্ঞানীকে 1923 সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

❑ গ্লুকাগন (Glucagon): আলফা (α) কোষ (আইলেটস কোষের 15–20%) থেকে ক্ষরিত এ হরমোন- (i) যকৃত ও পেশিতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং (ii) পরিপাক গ্রন্থির নিঃসরণ হার কমায়।

❑ সোমাটোস্ট্যাটিন (Somatostatin): ডেল্টা (δ) কোষ (আইলেটস কোষের 5–15%) থেকে ক্ষরিত এ হরমোন দেহে α ও β কোষের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

ডায়াবেটিস মেলিটাস বা ডায়াবেটিস (Diabetes mellitus or diabetes): অগ্ন্যাশয়ের বিটা (β) কোষ যখন যথেষ্ট পরিমাণ ইনসুলিন উৎপন্ন করতে পারে না অথবা শরীর যদি উৎপন্ন ইনসুলিন ব্যবহারে ব্যর্থ হয় তাহলে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে ডায়াবেটিস মেলিটাস বা ডায়াবেটিস বলে। এ অবস্থায় রক্তে অতিরিক্ত শর্করার (গ্লুকোজ) উপস্থিতির কারণে নানারকম শারীরিক অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। অনেকে এ রোগকে 'সকল জটিল রেগের জননী' বলে চিহ্নিত করেছেন। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের কারণে আমাদের বৃক্ক, যকৃত, হৃৎপিণ্ড, চোখ, দাঁত, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদি সকল কিছু নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

VII. অ্যাডরেনাল গ্রন্থি বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি (Adrenal gland or suprarenal glands)

প্রতিটি বৃক্কের সম্মুখ প্রান্তে টুপির মতো হলুদ বর্ণের একটি করে গ্রন্থি থাকে। এদের অ্যাডরেনাল গ্রন্থি বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি বলে। ডান বৃক্কের গ্রন্থি ত্রিকোণাকৃতির এবং বাম বৃক্কের গ্রন্থি অর্ধচন্দ্রাকৃতির ও কিছুটা বড়। যোজক কলা গঠিত রেনাল ফেসিয়া বা গ্যারোটা ফেসিয়া (renal fascia or Gerota fascia) নামক একটি সাধারণ আবরণ দ্বারা বৃক্ক ও অ্যাডরেনাল গ্রন্থি উভয়েই আবৃত থাকে। প্রতিটি অ্যাডরেনাল গ্রন্থি প্রায় 5 সেন্টিমিটার লম্বা, 3 সেন্টিমিটার প্রশস্ত এবং 1 সেন্টিমিটার পুরুত্ব বিশিষ্ট। পরিণত মানুষের দুটি অ্যাডরেনাল গ্রন্থির ওজন 7-10 গ্রাম হয়ে থাকে। প্রতিটি গ্রন্থি বহির্ভাগে কর্টেক্স এবং অন্তর্ভাগে মেডুলা নিয়ে গঠিত। এ গ্রন্থি থেকে যেসব হরমোন ক্ষরিত হয় তাদের নাম ও কাজ উল্লেখ করা হলো-

CS CamScanner

	হরমোনের নাম	কাজ
কর্টেক্স ক্ষরিত	গ্লুকোকর্টিকয়েড/কর্টিসল (Glucocorticoids/Cortisol)	১। এটি যকৃত ও পেশির গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ উদ্দীপিত করে। ২। এটি অন্ত্র থেকে চিনি ও লিপিড শোষণ হার বৃদ্ধি করে।
	মিনারেলোকর্টিকয়েড/অ্যালডোস্টেরন (Mineralocorticoids/ Aldosterone)	১। এটি বৃক্কের NaCl ও পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ২। এটি রক্তের প্লাজমার পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ৩। এটি পটাসিয়ামের (K) রেচন হার বৃদ্ধি করে।
	গোনাডোকর্টিকয়েড (Gonadocorticoids)	১। এটি ভ্রূণের যৌন বিভেদ নিয়ন্ত্রণ করে। ২। এটি যৌন গ্রন্থি, যৌন অঙ্গ ও গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।
মেডুলা ক্ষরিত	এপিনেফ্রিন/অ্যাডরেনালিন (Epinephrine/Adrenaline)	১। এটি হৃৎক্রিয়া, রক্তচাপ ও শর্করা বিপাক হার বৃদ্ধি করে। ২। এটি মূত্র উৎপাদন হ্রাস করে। ৩। এটি ভয়, উচ্ছাস ও শোক প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
	নরএপিনেফ্রিন/নরঅ্যাডরেনালিন (Norepinephrine/ Noradrenaline)	১। এটি দেহের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। ২। এটি রক্তনালিকার সঙ্কোচন ঘটায়ে প্রয়োজনে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। ৩। চোখে অশ্রু উৎপাদন বৃদ্ধি করে চোখকে সিক্ত রাখে।

VIII. গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (Gastric Glands) ও আন্ত্রিক গ্রন্থি (Intestinal glands)

পৌষ্টিকনালির প্রাচীরের অবস্থিত গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হরমোনকে **গ্যাস্ট্রিক হরমোন** বলে এবং এরা খাদ্য পরিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। *মানুষের খাদ্য পরিপাকের সংশ্লিষ্ট হরমোনগুলোর বিবরণ এ পুস্তকের ৩য় অধ্যায় অর্থাৎ খাদ্য ও পরিপাক অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।*

IX. পিনিয়াল বডি (Pinial body)

এটি একটি গোলাকার গ্রন্থি। একটি সরু বোঁটা দ্বারা এটি মস্তিষ্কের ডায়েনসেফালনের ছাদে সংযুক্ত থাকে। এ গ্রন্থি থেকে মেলাটোনিন নামক হরমোন ক্ষরিত হয় যাহা ত্বকের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে।

X. শুক্রাশয় (Testis), ডিম্বাশয় (Ovaries) ও অমরা (Placenta) থেকে ক্ষরিত হরমোনের বিবরণ ও কাজ ৯ম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

হরমোন (Hormone)

গ্রিক শব্দ *Hormao* = to excite বা উত্তেজিত করা হতে Hormone শব্দটির উৎপত্তি। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী **স্টারলিং** (Starling) এবং **বেলিস** (Bayliss) 1904 সালে সর্বপ্রথম Hormone শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁদের মতে **'হরমোন হলো এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা কোনো কোষগুচ্ছ হতে ক্ষরিত হয়ে লসিকা বা রক্ত বাহিত হয়ে দূরবর্তী অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট কোষগুচ্ছ বা কোষগুচ্ছসমূহকে প্রভাবিত করে।'**

দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কয়েকটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি, জননাঙ্গ এবং পৌষ্টিকনালির কিছু গ্রন্থি হতে হরমোন ক্ষরিত হয়। হরমোনের জৈব সংশ্লেষণ, সঞ্চয়, জৈব রসায়ন, শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কিত অধ্যয়নকে **এন্ডোক্রাইনোলজি** (Endocrinology) বলে।

হরমোনের বৈশিষ্ট্য

১। হরমোন এক অঙ্গের কোনো কোষ হতে ক্ষরিত হয়ে রক্ত বা লসিকা দ্বারা পরিবাহিত হয়ে দূরবর্তী অন্য অঙ্গের কোষের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।

CamScanner

২। হরমোন দেহে রাসায়নিক বার্তাবাহক (chemical messengers) হিসেবে কাজ করে এবং দেহের বিভিন্ন অংশে রাসায়নিক সমন্বয় ঘটায়।

৩। ভিটামিনের মতো হরমোন খুব কম ঘনত্বে ও অল্পমাত্রায় কাজ করে।

৪। হরমোনের কোনো ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাব (cumulative effect) নেই, স্বীয় কার্য শেষে হরমোন বিনষ্ট হয় এবং রেচন প্রক্রিয়ায় দেহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

৫। হরমোন দেহের কোনো ক্রিয়া বা প্রক্রিয়ার বিস্তারকে প্রভাবিত করে কিন্তু এসব ঘটনার সূচনা ঘটাতে পারে না।

৬। হরমোনের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভিটামিনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে।

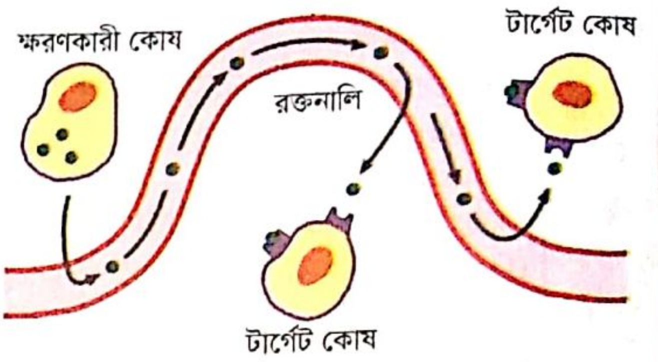

চিত্র ৮.২৯ হরমোনের ক্রিয়া

৭। হরমোন কিছু বিক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কিছু প্রক্রিয়ার দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা, দেহের বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে একাধিক হরমোন অংশগ্রহণ করে।

৮। রাসায়নিকভাবে অধিকাংশ হরমোনই পেপটাইড, প্রোটিন, গ্লাইকোপ্রোটিন বা স্টেরয়েড জাতীয়।

৯। অধিকাংশ হরমোনই পানিতে দ্রবণীয় বলে রক্ত বা লসিকা বাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছাতে পারে।

১০। হরমোন দেহের বিভিন্ন কলা ও তন্ত্রের শারীরবৃত্তীয় ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১১। হরমোন বহিঃকোষীয় তরলের উপাদান সঠিক রেখে কোষ ও তরলের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় সম্পর্ক বজায় রাখে।

১২। হরমোনের রাসায়নিক গঠন সম্পর্কিত বিস্তারিত জানার কারণে অধিকাংশ হরমোন গবেষণাগারে সংশ্লেষণ করা যায়।

দেহের বৃদ্ধিতে হরমোনের ভূমিকা

মানবদেহের বৃদ্ধিতে দুটি হরমোন প্রধান ভূমিকা রাখে। এগুলো হলো-পিটুইটারি গ্রন্থি ক্ষরিত গ্রোথ হরমোন (Growth Hormone-GH) এবং থাইরয়েড গ্রন্থি ক্ষরিত থাইরক্সিন হরমোন (Thyroxine Hormone or T4 hormone)। মানুষের দৈহিক বৃদ্ধিতে এ দুটি হরমোন নিম্নলিখিতভাবে কাজ করে-

দেহের বৃদ্ধিতে গ্রোথ হরমোনের ভূমিকা

গ্রোথ হরমোন বা সোমাটোট্রপিক হরমোন বা সোমাটোট্রপিন 191টি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত এক শিকল বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র প্রোটিন অণু। মানুষের উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধিতে এ হরমোন প্রধান ভূমিকা রাখে বলে একে গ্রোথ হরমোন বলা হয়। মানুষের বৃদ্ধিজনিত অধিকাংশ শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ এ হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন-

১। **কঙ্কালতন্ত্রের বৃদ্ধি:** গ্রোথ হরমোন অস্থি ও তরুণাস্থির বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে। গ্রোথ হরমোনের বহুমুখী প্রভাব অস্থির বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিত উপায়ে ভূমিকা রাখে:

- এ হরমোন কন্ড্রিওসাইট ও অস্টিওসাইটে প্রোটিন সঞ্চয় হার বৃদ্ধি করে, ফলে অস্থি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।
- এটি অস্থিতে ক্যালসিয়াম আয়ন সঞ্চয় হার বৃদ্ধি করে।
- এটি কন্ড্রিওসাইট ও অস্টিওসাইট বিভাজন হার বৃদ্ধি করে।
- এটি কন্ড্রিওসাইট কোষকে অস্টিওসাইটে রূপান্তর করে, ফলে অস্থি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

২। **বিপাক:** গ্রোথ হরমোনের সুনির্দিষ্ট বিপাকীয় প্রভাব রয়েছে যা দেহের বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে, যেমন-

- এ হরমোন কোষের অ্যামিনো অ্যাসিড গ্রহণ ও প্রোটিন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করে, ফলে দেহে পেশির বৃদ্ধি ঘটে।

- এটি দেহে সঞ্চিত অ্যাডিপোজ কলা থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে রক্তে মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, ফলে দেহের ক্ষয়রোধ হয়।
- এটি দেহ কর্তৃক গ্লুকোজ ব্যবহারের হার কমায়।

৩। **আয়ন বৃদ্ধি:** গ্রোথ হরমোন দেহে বিভিন্ন আয়নের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে যেগুলো দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক। এটি অন্ত্র হতে ক্যালসিয়াম আয়ন (Ca^{2+}) শোষণ এবং বৃক্ক হতে বিভিন্ন আয়ন পুনঃশোষণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৪। **অঙ্গের আকার বৃদ্ধি:** এ হরমোন অবিরাম প্রোটিন সংশ্লেষণ উদ্দীপিত করে এবং মস্তিষ্ক ব্যতিত দেহের সকল নরম অঙ্গাদির আকার বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক অবস্থা ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫। **দুগ্ধ উৎপাদন:** এ হরমোন অধিক দুগ্ধ উৎপাদনে স্তনগ্রন্থিকে প্রভাবিত করে যা শিশুর দৈহিক বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা রাখে।

৬। **লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি:** এটি এরিথ্রোপোয়েসিস (erythropoesis) প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে রক্তের লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

৭। **ওষুধ হিসেবে ব্যবহার:** শিশুদের অস্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি এবং বয়স্কদের হরমোন স্বল্পতার চিকিৎসায় গ্রোথ হরমোন ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বৃদ্ধ হওয়া ও স্থূলতা রোধে গ্রোথ হরমোন থেরাপি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

৮। **অস্বাভাবিক নিঃসরণ:** দেহে অস্বাভাবিক গ্রোথ হরমোন ক্ষরণের কারণে মানবদেহে তিনটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন-

- বামনত্ব (Dwarfism): শিশুকালে পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্রোথ হরমোন ক্ষরণ না হলে মানুষ বামন হয়।
- দৈত্যত্ব (Gigantism): শিশুকালে অস্থি গঠনের পূর্বে অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রোথ হরমোন ক্ষরিত হলে মানুষ দৈত্যাকৃতির হয়।
- গরিলাত্ব (Acromegaly): বয়স্ক অবস্থায় অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রোথ হরমোন ক্ষরিত হলে মানুষের হাত ও মুখমণ্ডলের অস্থি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে গরিলার মতো রূপ ধারণ করে। একে এক্রোম্যাগালি বলে।

দেহের বৃদ্ধিতে থাইরক্সিন হরমোনের ভূমিকা

থাইরক্সিন হরমোন (THs) মানুষের দৈহিক বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিতভাবে ভূমিকা রাখে-

১। এ হরমোন পিটুইটারি গ্রন্থিকে গ্রোথ হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে এবং গ্রোথ হরমোনের ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

২। এটি দেহের গাঠনিক প্রোটিন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করে, ফলে দেহের বৃদ্ধি ঘটে।

৩। থাইরক্সিন হরমোন বিভিন্ন কলার বিভেদন ও পরিপক্কার জন্য অত্যাবশ্যক। এর অভাবে অস্থির অসিফিকেশন ঘটে না এবং মানুষ পূর্ণাঙ্গতা পায় না।

৪। থাইরক্সিন হরমোন সকল ধরনের খাদ্যের বিপাক হার বৃদ্ধি করে যা দেহের বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক।

৫। এ হরমোন নিউরনের বিকাশ ও পূর্ণতা এবং মায়েলিন আবরণ সৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক।

৬। এ হরমোন কঙ্কালপেশির বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৭। এ হরমোন তরুণাস্থির বিভেদন ও পরিপক্কার জন্য অত্যাবশ্যক। এটি অস্থির দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বৃদ্ধি ঘটায়।

৮। এটি লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি, দুগ্ধ উৎপাদন, প্রজননতন্ত্র ও পৌষ্টিকতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে পরোক্ষভাবে দেহের বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

৯। অতিরিক্ত বা অল্প থাইরক্সিন ক্ষরণ উভয়েই দেহের জন্য ক্ষতিকর। দেহে অতিরিক্ত থাইরক্সিন ক্ষরণ (hyperthyroidism) হলে গয়টার বা গলগণ্ড (goitre) রোগ হয়। আবার কম থাইরক্সিন ক্ষরণ (hypothyroidism) হলে শিশুদের ক্রিটিনিজম (cretinism) এবং বয়স্কদের মিক্সিডেমা (myxedema) রোগ হয়।

CamScanner

দেহের বৃদ্ধিতে অন্যান্য হরমোনের ভূমিকা

মানুষের দৈহিক বৃদ্ধিতে অন্যান্য যেসব হরমোন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে সেগুলো হলো-ইনসুলিন, কর্টিকোস্টেরয়েড, সেক্স স্টেরয়েড, প্রোল্যাকটিন, গ্রোথ রিলিজিং হরমোন, ক্যালসিটোনিন, গ্লুকোকর্টিকয়েড ইত্যাদি।

দেহের শারীরবৃত্তীয় কাজে হরমোনের ভূমিকা

প্রায় 50 ধরনের হরমোন মানুষের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে জড়িত। এরা মানবদেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে নিম্নলিখিতভাবে ভূমিকা রাখে:

১। **খাদ্য পরিপাক:** গ্যাসট্রিন, সিক্রেটিন, কোলেসিস্টোকাইনিন, এন্টারোক্রাইনন, পেপটাইড YY ইত্যাদি হরমোন খাদ্য পরিপাককারী বিভিন্ন এনজাইম নিঃসরণ উদ্দীপিত করে।

২। **বিপাক ক্রিয়া:** ইনসুলিন, গ্লুকাগন, থাইরোক্সিন, STH ও ACTH লিপিড বিপাকে; ইনসুলিন, গ্লুকাগন, ইপিনেফ্রন, ভেসোপ্রেসিন, থাইরক্সিন, সেক্স হরমোন শর্করা বিপাকে এবং থাইরক্সিন, টেস্টোস্টেরন ও গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন প্রোটিন বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। **রেচন:** অ্যালডোস্টেরন হরমোন বৃক্কের NaCl ও পানি শোষণ ক্ষমতা এবং K রেচন হার বৃদ্ধি করে; ইপিনেফ্রিন হরমোন মূত্র উৎপাদন হ্রাস করে।

৪। **রক্তচাপ:** ইপিনেফ্রিন, নরইপিনেফ্রিন, ভেসোপ্রেসিন হরমোন হৃৎক্রিয়া ও রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।

৫। **প্রোটিন সংশ্লেষণ:** থাইরক্সিন, গ্রোথ হরমোন, টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন হরমোন কোষে প্রোটিন সংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি করে।

৬। **পানিসাম্যতা রক্ষা:** ভেসোপ্রেসিন ও গ্লুকোকর্টিকয়েড বৃক্ককে অতিরিক্ত পানি শোষণে উদ্দীপিত করে দেহের পানি সাম্যতা রক্ষা করে।

৭। **আয়ন পরিবহন:** অ্যাল্ডোস্টেরন হরমোন কোষ ও দেহতরলের Na^+ ও K^+ আয়ন সাম্যতা রক্ষা করে।

৮। **প্রজননে:** ইস্ট্রোজেন ঋতুচক্র ও স্তনগ্রন্থির বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে, প্রোজেস্টেরন জরায়ুর প্রাচীরে নিষিক্ত ডিম্বাণু স্থাপন এবং গর্ভাবস্থায় স্তনগ্রন্থির বিকাশ ঘটায় এবং টেস্টোস্টেরন শুক্রাণুজননে শুক্রাশয়কে উদ্বুদ্ধ করে।

৯। **সন্তান প্রসব:** প্রসবের সময় রিলাক্সিন শ্রোণিদেশীয় লিগামেন্ট ও পেশির প্রসারণ ঘটিয়ে এবং অক্সিটোসিন জরায়ুর সঙ্কোচন ঘটিয়ে প্রসব কাজ ত্বরান্বিত করে।

১০। **বয়োঃসন্ধি:** টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন ও গোনাডোকর্টিকয়েড দেহে গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

১১। **দুগ্ধ ক্ষরণ:** গ্রোথ হরমোন, থাইরক্সিন, ইস্ট্রোজেন, প্রোল্যাকটিন গর্ভবতী ও সন্তান প্রসবকারী মায়ের স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

১২। **দেহের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ:** মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন মেলানোসাইটের পিগমেন্ট সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে ত্বকের বর্ণ নির্ধারণ করে।

১৩। **শোষণ:** অ্যাল্ডোস্টেরন হরমোন বৃক্কের Na^+ শোষণ, প্যারাথরমোন ও ক্যালসিটোনিন হরমোন বৃক্কের Ca^{++} শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

১৪। **রোগ প্রতিরোধ:** থাইমোসিন হরমোন লিম্ফোসাইট ও অ্যান্টিবডি উৎপাদন উদ্দীপিত করে দেহে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

৮.৫ মানুষের আচরণের উপর হরমোনের প্রভাব

বিজ্ঞানীগণ মানুষের আচরণের উপর হরমোনের প্রভাব নিয়ে বহুবছর যাবৎ গবেষণা করছেন। আচরণ সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের উত্তর আজও বিজ্ঞানীগণ পায়নি, তবুও এসংক্রান্ত তাদের অনেক মতবাদের সুস্পষ্ট প্রমাণ তারা পেয়েছেন। মানুষের উদ্যোমতা, রাগ, অনুরাগ, বিষন্নতা, দুশ্চিন্তা, আগ্রাসন প্রভৃতি আচরণ হরমোন নিয়ন্ত্রিত বলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। মরিস ও মাইস্টো (Morris and Maisto, 2002) এর মতে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ হরমোন জাতীয়

CamScanner

রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণের মাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্রের সাথে সমন্বয় সাধন করে কাজ করে এবং মানুষের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ ও আচরণ প্রকাশে প্রধান ভূমিকা পালন করে। মন-মানসিকতার উপর রয়েছে হরমোনের যাদুকরি প্রভাব। হরমোনের কারণে ব্যক্তির মনমেজাজের উঠানামা হয়। মানুষের আচরণের অসঙ্গতি, মানসিক বিশৃঙ্খলা ও মনের বিকার সাধনেও রয়েছে বিভিন্ন হরমোনের প্রভাব।

বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ক্ষরিত হরমোন মানুষের আচরণে কীভাবে প্রভাব ফেলে তা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

১। থাইরক্সিন (Thyroxine): অস্বাভাবিক মাত্রার থাইরক্সিন ক্ষরণ উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, মনোযোগ হ্রাস করে, কাজের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি করে এবং অনিদ্রা, ক্লান্তি ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করে।

২। প্যারাথরমোন (Parathormone): এ হরমোন নিঃসরণ উত্তেজনার মাত্রাকে প্রভাবিত করে।

৩। মেলাটোনিন (Melatonin): মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্রন্থি ক্ষরিত মেলাটোনিন হরমোন মানুষের ঘুম-জাগ্রত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এ হরমোনের অসম ক্ষরণ মানুষের অনিদ্রার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৪। টেস্টোস্টেরন (Testosterone): শুক্রাশয় থেকে অধিক মাত্রায় টেস্টোস্টেরন হরমোন ক্ষরণের ফলে মানুষের উগ্রতা বেড়ে যায় বলে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া ছেলেদের কাজের নৈপুণ্যতা, কথাবলার দক্ষতা এবং অনুধাবন ক্ষমতা এ হরমোন ক্ষরণের সাথে সম্পৃক্ত।

৫। ইস্ট্রোজেন (Estrogene): মেয়েদের কাজের নৈপুণ্যতা, কথাবলার দক্ষতা এবং অনুধাবন দক্ষতা ইস্ট্রোজেন হরমোন ক্ষরণের সাথে সম্পৃক্ত।

৬। অ্যাডরেনালিন (Adrenaline): বৃক্ক সংলগ্ন অ্যাডরেনাল গ্রন্থি ক্ষরিত অ্যাডরেনালিন হরমোন মানসিক চাপ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে। এ হরমোন মানুষের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব গঠনে বিশেষ সহায়তা করে।

৭। ইপিনেফ্রিন (Epinephrine): মরিস ও মাইস্টো (2002) এর মতে অ্যাডরেনাল গ্রন্থি ক্ষরিত ইপিনেফ্রিন হরমোন মানুষের ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে।

৮। নরইপিনেফ্রিন (Norepinephrine): অ্যাডরেনাল গ্রন্থি ক্ষরিত নরইপিনেফ্রিন হরমোন মানুষের মানসিক চাপ, আক্রমণ ও পলায়ন আচরণ বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে।

৯। অন্যান্য হরমোন (Other hormone): পিটুইটারি গ্রন্থি ক্ষরিত বিভিন্ন হরমোন অন্যান্য সকল হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে বলে এ গ্রন্থি ক্ষরিত হরমোনগুলো মানুষের সকল ধরনের আচরণের সাথে জড়িত। এ গ্রন্থি থেকে অ্যাড্রিনাল কর্টিকোট্রফিক হরমোন (ACTH) ক্ষরণের জন্যই মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভবপর হয়।

হরমোন ভারসাম্যহীনতার কারণে অনেক মানুষে স্থায়ী বিষন্নতা দেখা দেয় যা তাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়। সবচেয়ে শক্তিশালি হরমোনজনিত ক্রিয়া সম্ভবত মানুষের প্রেম-ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। তাৎক্ষণিক যৌন আকর্ষণ সাধারণত একটি হরমোনজনিত সাড়াদান। অনেকক্ষেত্রে হরমোনের ক্রিয়ার প্রভাব ঋতু নির্ভর হয়ে থাকে। যেমন- বছরের অন্য সময় অধিকাংশ মানুষ বিষন্নতায় ভুগলেও বসন্তকালে প্রেমে পড়ে ও কবি হয়ে যায়।

অনিয়ন্ত্রিত হরমোন ব্যবহারের ফলাফল

হরমোন হচ্ছে শক্তিশালি রাসায়নিক পদার্থ যা আমাদের দেহের স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখতে সহায়তা করে। আমাদের দেহে প্রাকৃতিকভাবেই সর্বদা হরমোন উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন উপায়ে দেহে প্রভাব বিস্তার করে। তবে কিছু হরমোনের মাত্রা বয়সকালে কমতে থাকে অথবা আমাদের দেহও পর্যাপ্ত হরমোন উৎপন্ন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। সেসব ক্ষেত্রে বাইরে থেকে হরমোন প্রয়োগ করে চিকিৎসা করা হয়। এসব হরমোনের মধ্যে হিউমেন গ্রোথ হরমোন (Human growth hormone-HGH) ও স্টেরয়েড হরমোন (এন্ড্রোস্টেরন, টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন) প্রধান। শিশু ও বয়স্কদের কয়েকটি রোগের চিকিৎসায় এসব হরমোন ব্যবহার করা হয়। তবে এদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানব স্বাস্থ্যে বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

CamScanner

বিশ্বব্যাপী পুরুষেরা যৌবন ধরে রাখার জন্য সেক্স হরমোন টেস্টোস্টেরন ও HGH ব্যবহার করছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রে 1999 সালে পুরুষ হরমোন হিসেবে বিবেচিত টেস্টোস্টেরনের ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয় মাত্র 64 হাজার ৪শ টি, অথচ 2008 সালে এ হরমোনের প্রেসক্রিপশন ছিল প্রায় 33 লক্ষ। মধ্যবয়সী পুরুষেরা বয়স ধরে রাখতে এ হরমোন ব্যবহার করছেন বলে সম্প্রতি এ তথ্যটি দিয়েছেন *The Los Angeles Times* পত্রিকা। এছাড়া বয়স ধরে রাখার জন্য কিংবা শরীরে অতিরিক্ত শক্তি পাওয়ার জন্য অনেকে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই HGH ব্যবহার করে থাকে। ক্রীড়াবিদরা দেহের অতিরিক্ত শক্তি ও দম পাওয়ার জন্য বিভিন্ন স্টেরয়েড হরমোন গ্রহণ করছেন। এসব হরমোনের অতিরিক্ত ব্যবহার মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এসব হরমোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে মানুষের নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো দেখা দেয়:

১। দেহ ও মুখমণ্ডলের ত্বকের বিভিন্ন অংশে অ্যাকনি (acne) বা বিশ্রী দাগ পড়।

২। স্তন অস্বাভাবিকভাকে বড় হয়ে যায়, একে গাইনেকোমাস্টিয়া (gynecomastia) বলে।

৩। অপরিণত বয়সে মাথায় টাক দেখা দেয়।

৪। দেহের ভাল কোলেস্টেরল HDL (high density lipoprotein) এর মাত্রা কমে যায় এবং মন্দ কোলেস্টেরল LDL (low-density lipoprotein) এর মাত্রা বেড়ে যায়।

৫। HGH গ্রহণে নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

৬। অ্যাক্রোমেগালি (acromegaly) রোগ হয়, এক্ষেত্রে দেহে অস্বাভাবিকভাবে বেশি লোম গজায়।

৭। পেশির দুর্বলতা ও হৃৎরোগ দেখা দেয়।

৮। প্রোস্ট্রেট ক্যানসারের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

৯। বৃক্কের অকার্যকারিতা, লিভার টিউমার, লিভার অকার্যকারিতা, শুক্র উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, যৌন ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি দেখা দেয়।

১০। আচরণে রুক্ষতা, উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা দেখা দেয়।

বার্ধক্য রোধে নিজ থেকে হরমোন প্রয়োগ করা ঠিক নয়। আমাদের দেশে অনেক হাতুড়ে ডাক্তার অথবা যারা ফার্মেসিতে ওষুধ বিক্রি করেন অথবা সাধারণ এমবিবিএস ডাক্তারও তাদের প্রাত্যহিক প্র্যাকটিস জীবনে যৌন সমস্যায় আক্রান্ত রোগীর হরমোন পরীক্ষা না করে সরাসরি হরমোন ওষুধ ব্যবহারের পরামর্শ দেন বা ব্যবস্থাপত্র দেন। এটি কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বার্ধক্যের সব যৌন সমস্যা বা যৌন দুর্বলতার কারণই হরমোনজনিত নয়। কাজেই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিত।

100%

এনজাইম ও হরমোনের মধ্যে পার্থক্য

এনজাইম	হরমোন
১। সনালী গ্রন্থি থেকে কিংবা কোষাভ্যন্তরে নিঃসৃত হয়।	১। অনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়।
২। উৎসের নিকটবর্তী স্থানে ক্রিয়া করে।	২। উৎস থেকে দূরবর্তী স্থানে ক্রিয়া করে।
৩। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে।	৩। রাসায়নিক বিক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে এবং বিক্রিয়া শেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
৪। কাজের গতি দ্রুত ও ফলাফল তাৎক্ষণিক।	৪। কাজের গতি মন্থর ও ফলাফল সুদূরপ্রসারী।
৫। রাসায়নিক বিক্রিয়া উভমুখী।	৫। রাসায়নিক বিক্রিয়া একমুখী।
৬। নালী দ্বারা পরিবাহিত হয়।	৬। রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়।
৭। উদাহরণ : ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ ইত্যাদি।	৭। উদাহরণ: গ্রোথ হরমোন, থাইরক্সিন, ইনসুলিন ইত্যাদি।

CamScanner